উজ্জ্বল ঘোষ

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী : কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

বই পড়তে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের।

ভূমিকা

বইটার নাম দেখে এ বইয়ে কি আছে তা বোঝা শক্ত তাই ইচ্ছে না থাকলেও ভূমিকা একটা লিখতে হচ্ছে।

শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ, প্রকাশক, বলেছেন নামটা জুতসই নয়। অমৃতবাজারের শ্রীনীলকমল দত্ত বলেছেন নাম থেকে বইয়ের বিষয়বস্তু বোঝা যায় না এবং মেজর অজিত রায় মন্তব্য করেছেন, 'সত্যি কথাই যখন লিখছেন তখন সত্যি কিনা সে প্রশ্ন রাখেন কেন?'

কিন্তু 'এ কি সত্যি' নামটাই দিলাম। আমার একমাত্র যুক্তি যে যখনই আমরা কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথা শুনি তখন যে কোন সূত্রেই ঘটনাটা শুনিনা কেন মনে একটা প্রশ্ন থেকে যায় এ কি সত্যি?

এই বইটা হচ্ছে—মানুষ মরার পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা এবং আত্মার পৃথিবীর লোকের সঙ্গে যোগাযোগ বা অন্য কিছু করবার ক্ষমতা থাকে কিনা তারই একটা আলোচনা।

যাঁরা এ বিষয়ে জানতে চান আশা করি তাঁরা আলোচনাটা পড়ে আনন্দ পাবেন। দর্শন, পুনর্জন্ম, মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা লোকের অভিজ্ঞতা, ঘুম, সম্মোহিত অবস্থা এবং হিষ্টিরিয়া রোগে মানুষের অস্বাভাবিক ব্যবহার, অ্যাস্ট্রাল ট্রাভেল্ অর্থাৎ আত্মার স্থূল শরীর ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীরে বেড়ানো, বাইলোকেশন অর্থাৎ একই সময়ে একই লোকের দুই জায়গায় অবস্থান, মিডিয়াম অবস্থার মানসিক ক্রিয়াকলাপ, মিডিয়ামের উপস্থিতিতে বাস্তব ভৌতিক ঘটনাবলী, যোগবলে আত্মা আনা এবং আপনা আপনি ঘটা বিভিন্ন প্রকারের ভৌতিক ঘটনা ইত্যাদি নানা দিক থেকে দুই বন্ধুর তর্কের মধ্য দিয়ে আলোচনাটা করা হয়েছে। বিষয়টা সিরিয়াস্ কিন্তু আলোচনাটা সহজভাবে করার চেষ্টা করেছি।

যাঁরা গল্প পড়তে ভালবাসেন তাঁরাও বইটা পড়ে আনন্দ পাবেন আশা রাখি। এই বইতে আছে বহু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা যা সাধারণ একজন লোক বললে আমিও হয়ত বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এসব যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন বলে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, অ্যালফ্রেড্ রাসেল্

ওয়ালেস্, স্যার্ উইলিঅ্যাম ক্রুক্স্, স্যার্ উইলিঅ্যাম ব্যারেট্, স্যার্ অলিভার লজ এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত চার্লস্ রিচেট্।

যে সব গ্রন্থকারের ও প্রকাশকের বই, জার্ন্যাল ও প্রোসীডিং থেকে আমার বইয়ের কিছু কিছু উপকরণ পেয়েছি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই ও তাঁদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করি। বইয়ের যথাযোগ্য স্থানে এ সম্পর্কে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি।

যাঁদের অভিজ্ঞতার কথা এ বইতে উল্লেখ করেছি এবং যাঁরা আমাকে নানারকম পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে বা অন্যভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সবাইকেও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

উজ্জ্বল ঘোষ

এ কি সত্যি

"কি লিখছ এত মন দিয়ে ?"

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি—সুশান্ত। অনেকদিন পর ওকে দেখে খুবই খুশী হই। দুজনে দুজনার খবরাখবর নেবার পর সুশান্ত আবার জিজ্ঞাসা করে, "কি লিখছিলে এত মন দিয়ে; টেণ্ডার কষছিলে নাকি ?"

আমি একটু হেসে বলি, "না ভাই, মরার পরে মানুষের আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা এবং আত্মা পৃথিবীর লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে কিনা সে বিষয়ে একটা বই লিখব ভেবে তার খসড়া করছি।"

সুশান্ত অবাক হয়ে বলে, "হঠাৎ আবার এ সখ চাপলো কেন ?"

"নানা লোকের কাছে নানা রকম ভৌতিক কাহিনী শুনে এ বিষয়ে কিছু জানবার কৌতূহল হয় তাই ইদানীং এ বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করেছি। এখন ভাবছি এ সম্পর্কে একটা বই লিখে ফেলি।"

"ভূত-টূত আমি বিশ্বাস করিনা" সুশান্ত হেসে বলে।

"শোনো এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় কি বলছে।

'Wax gloves have been produced that are reported to have been made by spirit hands dipped in molten wax and dematerialized after the wax solidified.' "[১]

[মোমের হাত-মোজা তৈরী হয়েছে যা ভৌতিক হাত গলানো মোমে ডুবিয়ে বানানো বলে বলা হয়েছে এবং মোম শক্ত হয়ে যাবার পর (হাত) মিলিয়ে গেছে।]

সুশান্ত এবার খাড়া হয়ে বসে বলে, "অ্যাঁ ? এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতে একথা লিখেছে ?"

আমি বলি, "হ্যাঁ ভাই। আমিও আগে ভূত বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু ইদানীং এ বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করে বিশেষ করে কয়েকটা ইংরেজী বই পড়ে আমার এখন ধারণা হয়েছে যে মানুষ মরার পরেই সব শেষ হয় না। এই বইগুলো যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কোন রকম গোঁড়ামি বা অন্ধ বিশ্বাসের ভাব নিয়ে লেখেন নি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিষয়টির বিচার করেছেন। বিলেতে সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেড্রিক মায়ার্সের লেখা হিউম্যান পার্সন্যালিটি অ্যান্ড্ ইট্স্ সারভাইভ্যাল অভ্ বডিলি ডেথ্, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার্ উইলিঅ্যাম ক্রুক্সের লেখা রিসার্চেস্ ইন্ দি ফেনোমেনা অভ্ স্পিরিচুয়ালিজ্ম্ এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক চার্লস্ রিচেটের লেখা থার্টি ইয়ার্স্ অভ্ সাইকিক্যাল রিসার্চ, এই তিনটে বই পড়লেই আমার মনে হয় তোমারও মত পরিবর্তন হবে।

আচ্ছা তুমি একটু বোসো ভাই আমি আগে চায়ের কথা বলে আসি।" বলে আমি বেরিয়ে যাই।

চায়ের কথা বলতে গিয়ে মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ফিরে এসে সুশান্তকে বলি, "তোমার তাড়া না থাকলে এক কাজ করা যাক, মানুষ মরার পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা এবং আত্মা পৃথিবীর লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে কিনা সে বিষয়ে দুজনে আলোচনা করে টেইপ্ রেকর্ড করে ফেলি। বইটা এভাবে লিখলে বিষয়টা পরিস্কার হবে অতএব আলোচনাটা গোড়ার থেকেই শুরু করি।"

"আমার কোন তাড়া নেই।" বলে সুশান্ত সোজা হয়ে বসে।

চা খাওয়া শেষ হলে টেইপ্ রেকর্ডারটা চালিয়ে দিয়ে আমি বলতে শুরু করি, "এই আলোচনার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আত্মা শরীর থেকে স্বতন্ত্র কিনা ?

যদি আমরা চিন্তা করি 'আমি কে?' তাহলে প্রথমে মনে হবে আমার শরীরটাই আমি। কিন্তু যদি ভাবি যে হাত, পা, চোখ, কান এগুলোই কি আমি? তখন মনে হবে না তা ত' নয়। একটা হাত, দুটো পা যদি কেটে ফেলা হয়, কিম্বা চোখ কান যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলেও ত' আমি আমিই থাকবো। এমন কি হার্ট নষ্ট হয়ে গেলেও ত' আর এক জনের হার্ট লাগিয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকা যায়, আমির ত' তাতে পরিবর্তন হয় না। অতএব আমি শরীর হতে ভিন্ন।

আমি চিন্তা করি, সুখ দুঃখ ভোগ করি, ইচ্ছা করি—শরীর আমার ইচ্ছায় কাজ করে। আমি কর্তা, শরীর আমার যন্ত্র। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই 'আমি'ই হচ্ছে আত্মা।

এই বিষয়টা আর এক ভাবে চিন্তা করা যেতে পারে। মানুষের ক্রিয়াকলাপ দুই ভাগে ভাগ করা যায়—কিছু ক্রিয়াকলাপ শরীরের ওপর নির্ভর করে যা অন্যে দেখতে বা জানতে পারে এবং যার সঙ্গে শরীরের কোন না কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পষ্ট যোগাযোগ বুঝতে পারা যায়, যেমন হাঁটা চলা, কথা বলা ইত্যাদি। অতএব এই কাজগুলির কর্তা শরীর। কিন্তু কতগুলি ক্রিয়াকলাপের বা প্রক্রিয়ার বিষয় মানুষ নিজে ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না এবং যার সঙ্গে শরীরের কোন স্পষ্ট যোগাযোগও বুঝতে পারা যায় না, যেমন চিন্তা করা, সুখ দুঃখ অনুভব করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। অতএব এই প্রক্রিয়াগুলির কর্তা শরীর হতে ভিন্ন। এই কর্তাই হচ্ছে আত্মা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে শরীর নষ্ট হয়ে গেলে অর্থাৎ মানুষ মরে গেলে আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা?"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সুশান্ত বলে, "শরীর নষ্ট হলে সবই শেষ হয়ে যায়, আত্মা শরীর থেকে পৃথক কিছু হতে পারে না। চিন্তা করা, ইচ্ছা করা, সুখ দুঃখ অনুভব করা, এ সব হচ্ছে ব্রেইনের

কাজ, ব্রেইনই এদের কর্তা। ব্রেইন নষ্ট হয়ে গেলে চিন্তা করা, ইচ্ছা করা সবই বন্ধ হয়ে যায়।"

"ব্রেইন শরীরের একটা অঙ্গ এবং আত্মার একটা যন্ত্র, যা আত্মাকে কিছু কিছু জিনিস জানতে বা বুঝতে সাহায্য করে এবং আত্মার ইচ্ছা শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দিয়ে পালন করায়। চিন্তা করা, ইচ্ছা করা, সুখ-দুঃখ অনুভব করা, এটা মস্তিষ্কের কাজ নয় এবং মস্তিষ্ক এদের কর্তা হতে পারে না, আত্মচেতনার ত' কোন প্রশ্নই ওঠে না। একটা জড় পদার্থ কি কখনও ভাবতে পারে 'আমি কে ?'

কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ব্রেইনের বেশ খানিকটা অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা বা সুখ দুঃখ অনুভব করার ক্ষমতার কোন হ্রাস হয়নি। 'কনশ্যাস্ টু আনকনশ্যাস্' বইটায় এ ধরনের কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাবে। বইটা লিখেছেন ডাঃ গুস্তাভ্ গেলে, যিনি প্যারিসের ইন্টারন্যাশ্ন্যাল্ মেট্যাফিজিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন।

১৯৫০ সালের মে মাসে 'টুমরো ম্যাগ্যাজীন্'-এ প্রকাশিত 'সায়েন্স স্টাডিজ ইনটিউশান্' প্রবন্ধে ডাঃ রাসেল্ জি. ম্যাক্ রবার্ট মন্তব্য করেছেন যে 'ব্রেইনের ওপর আধুনিক কালের সার্জিক্যাল এবং ইলেক্ট্রোগ্রাফিক গবেষণামূলক পরীক্ষা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে শরীরের সব অংশের যোগ ফলের থেকে মন বেশী।'[১]

আত্মা সম্পর্কে একটি ধারণাও ঠিক তাই—পুরো মানুষ থেকে শরীর বাদ দিলে যা থাকে সেটাই আত্মা। একই ধারণা আর

১। 'Science studies intuition', Russel G. Mac Robert, 'Tomorrow Magazine,' May 1950, Vol. IX, No 9.

'The Enigma of out-of-Body-Travel'—Sussy Smith. (A Signet Mystic Book). Published by the New American Library. Page 56.

এক ভাবে প্রকাশ করা হয়—জীবিত ও মৃত মানুষের পার্থক্যই হচ্ছে আত্মা।

অনেক বৈজ্ঞানিক যদিও মনে করেন যে মন ব্রেইনের ক্রিয়া মাত্র কিন্তু তাঁরা মানুষের আত্মচেতনাব কোন ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।”

সুশান্ত চুপ করে রইল।

আমি আবার বলতে শুরু করি, “এবার আত্মার সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের ধারণা এবং তার আগে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

বেদের থেকেই ভারতীয় দর্শনের শুরু বলা চলে অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের জন্মের ১৫০০ বছর আগে আর্যেরা যখন ইরাণ থেকে এসে বেদ রচনা শুরু করেন। হাজার বছরেরও বেশী ধরে বেদ রচনা চলে। প্রথমে রচনা হয় বেদের সংহিতাগুলি—ঋক, সাম, যজুঃ, এবং অথর্ব, তারপর ব্রাহ্মণ, তারপর আরণ্যক এবং সবচাইতে শেষে উপনিষদ। উপনিষদ সবচাইতে শেষে রচনা হয়েছিল বলে উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। প্রথম দিকে ঋষিরা দেব দেবীর পূজা, যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কর্ম এসব দিকেই বেশী মন দিয়েছিলেন এবং সংহিতা থেকে আরণ্যক পর্যন্ত রচনাগুলি এসব নিয়েই লেখা। সেজন্য বেদ থেকে আরণ্যক পর্যন্ত রচনাগুলিকে বেদের কর্মকাণ্ড বলা হয়। পরের দিকে ঋষিদের চিন্তাধারা হল অন্তর্মুখী। তাঁরা বাইরের জগৎ, পূজা, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদিতে উদাসীন হয়ে আত্মজ্ঞান লাভের দিকে মন দিলেন। উপনিষদে এই জ্ঞানের কথাই লেখা হয়েছে বলে উপনিষদকে বলা হয় বেদের জ্ঞান কাণ্ড।

বৈদিক যুগের পরে মহাকাব্যের যুগ খ্রিস্টপূব ৫০০ বছর থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে রচনা হয় মহাভারত ও রামায়ণ। মহাভারতের ষষ্ঠ খণ্ড, ভগবদ্গীতা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। ওই যুগেই আরও তিনটি দার্শনিক মত প্রচারিত হয়—চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ।

মহাকাব্যের যুগের পর ছয়টি দার্শনিক মত প্রচারিত হয় যাকে বলা হয় ষড় দর্শন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শন। রাধাকৃষ্ণাণ এটাকে পাণ্ডিত্যের যুগ বলেছেন।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে শরীর থেকে আত্মার পৃথক সত্তা এবং আত্মার অমরতায় বিশ্বাস ছিল। ঋক বেদে জন্মান্তরবাদের কোন উল্লেখ নেই। তখন ধারণা ছিল যারা ভাল কাজ করে তাদের আত্মা স্বর্গে যায়, যারা খারাপ কাজ করে তাদের আত্মা নরকে যায়।

উপনিষদেই আত্মার স্বরূপ, জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ প্রথম প্রকাশ পায়। আর্যেরা আসবার আগে, প্রাচীন ভারতে আত্মা সম্পর্কে যেসব ধারণা ছিল সেগুলি উপনিষদের এই সব মতবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

মহাকাব্যের যুগে, ভগবদ্‌গীতায় উপনিষদের মতবাদের ক্রমবিকাশ হয় এবং ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

আধ্যাত্মিকতার জটিল তত্ত্ব ও বিশদ বিবরণ বাদ দিয়ে এই মতবাদগুলি মোটামুটি এই রকম—

প্রথমে হচ্ছে মানুষের স্থূল শরীর, তার ভেতর সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীরই হচ্ছে মানুষের ভিতরকার বা মনের জগৎ অর্থাৎ চিন্তা, ধারণা, কল্পনা, আসক্তি, কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদির জগৎ। তারও ভেতরে হচ্ছে মানুষের আত্মা। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম এবং আত্মার অস্তিত্বের জন্যই মানুষ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা।

আত্মা সনাতন, এর জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। শরীর নষ্ট হলে আত্মা সূক্ষ্ম শরীরে আবৃত হয়ে স্থূল শরীর ছেড়ে চলে যায়। সূক্ষ্ম শরীরে নিহিত থাকে পূর্বতন জীবনের সমস্ত সংস্কার, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, নৈতিক উৎকর্ষতা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি।

অশরীরী হয়ে আত্মা মহাশূন্যের বিভিন্ন স্তরে পিতৃলোক, চন্দ্রলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি বিভিন্ন লোকে যায়;

উপনিষদে যার বিশদ বর্ণনা আছে এবং সেখানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকে। তারপর আবার মর্তলোকে ফিরে এসে সূক্ষ্ম শরীর সঙ্গে নিয়ে অন্য দেহ ধারণ করে। এই ভাবে আত্মা অনন্তকাল ধরে একের পর এক দেহ ছেড়ে একের পর এক দেহ ধারণ করে। একেই বলে জন্মান্তরবাদ।

এই জন্মান্তরবাদ আবার কর্মবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক কাজেরই যেমন একটা কারণ থাকে, তেমন প্রত্যেক কাজেরই একটা ফল থাকে। যে যেরকম কাজ করবে তাকে সেরকম ফল ভোগ করতে হবে। কর্ম বলতে শুধু শারীরিক কাজই বুঝায় না। মানসিক কাজও হতে পারে, খারাপ চিন্তা করাও খারাপ কাজ। কামনা বাসনার থেকে কর্ম এবং কর্মের থেকে কর্মফলের উৎপত্তি। কর্মফল এক অদৃশ্য শক্তি সৃষ্টি করে এবং এই শক্তিই আত্মার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করে। এক জীবনে মানুষ যে কাজ করে তার কোন কোন কাজের ফল সেই জীবনে পেলেও সব কাজের ফল সেই জীবনে শেষ হয় না, তাই কৃত কর্মের ফল ভোগ করার জন্য তার আবার জন্ম হয়। এই ভাবে চলে জন্ম মৃত্যুর চক্র।

শরীরের মৃত্যু ঘটলে আত্মা কোন লোকে যাবে ও কতদিন সেখানে থাকবে এবং তারপর পৃথিবীতে ফিরে এসে কোথায় কোন অবস্থায় কি রকম দেহ ধারণ করবে সবই নির্ভর করবে কর্মফলের ওপর। খারাপ কাজ করলে জন্তু জানোয়ার বা পোকা মাকড় হয়েও জন্ম নিতে হতে পারে।

জন্ম জন্ম ধরে সৎ ও নিষ্কাম কর্মের দ্বারা পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্মফল ক্ষয় হয়ে গেলে আত্মার ব্রহ্মজ্ঞান হয়—এবং নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে পরমব্রহ্মে বিলীন হয়। একেই বলা হয় মোক্ষলাভ। তারপর আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়না।

মহাকাব্যের যুগে জড়বাদী চার্বাক দর্শন আত্মার শরীর থেকে ভিন্ন সত্তা, পরলোক, জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ কিছুই বিশ্বাস

করে না। দর্শন শাস্ত্র হিসাবে চার্বাক দর্শনের বিশেষ কোন মূল্য নেই।

জৈন দর্শন মতে আত্মা দেহাতিরিক্ত সত্তা। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম এবং আত্মার অস্তিত্বের জন্যই জীব জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা সনাতন, স্বগুণ ও সক্রিয়। জৈন দর্শন, কর্মবাদ ও জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী।

বৌদ্ধ দর্শন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই দর্শনে পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়া বা জ্ঞানের প্রবাহই আত্মা। কিন্তু এই দর্শন কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। সনাতন আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যা করা শক্ত।

পাণ্ডিত্যের যুগের দার্শনিক মতগুলির মধ্যে আত্মার স্বরূপ বা গুণাগুণ নিয়ে মতভেদ থাকলেও সবগুলি মতই সনাতন আত্মার অস্তিত্ব, কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে।

আত্মা শরীর থেকে স্বতন্ত্র সত্তা কোরানেও একথা বলে। কোরান বলে যে প্রতিদিন রাত্রে ঘুমের সময় মানুষের আত্মা ভগবানের কাছে যায় আবার সকালে ফিরে আসে।

পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মা এবং মন এই দুটো শব্দ একই অর্থে ব্যবহার হয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে মনকে বলা হয় অন্তরিন্দ্রিয়। মন পরিবর্তনশীল আত্মা অপরিবর্তনীয়।

আত্মা শরীর থেকে স্বতন্ত্র সত্তা এই মত পাশ্চাত্য দর্শনেও অনেক দিন থেকে চলে আসছে।

গ্রহণের কারণ আবিষ্কর্তা গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস্ সর্ব-প্রথম এই মত পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেন। তিনি খ্রিস্ট জন্মের ৫০০ বছর আগে জন্মে ছিলেন।

তাঁরও আগে গ্রীক দার্শনিক পাইথ্যাগোরাস্, জিওমেট্রিতে যাঁর নামে একটা থিওরেম আছে, জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করতেন। মানুষের

আত্মা জন্তু জানোয়ার হয়ে জন্ম নিতে পারে এবং পবিত্র জীবন যাপন করলে শরীর থেকে মুক্তি পেতে পারে এ বিশ্বাসও পাইথ্যাগোরাসের ছিল। এক দিন একজন লোককে একটা কুকুরকে মারতে দেখে তিনি বলেছিলেন, 'ওকে মেরোনা, ওটা আমার এক বন্ধুর আত্মা। ওর চীৎকার শুনেই আমি চিনতে পেরেছি।'[১] এই ঘটনাটা এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় পেয়েছি।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, যাঁর চিন্তাধারা আজ পর্যন্ত সভ্য জগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে, সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মেই আত্মার শরীর হতে পৃথক সত্তা এবং অমরতা সম্পর্কে কিছু না কিছু ধারণা আজ শত শত বছর ধরে চলে আসছে।"

সুশান্ত এবার সোজা হয়ে বসে বলে, "দেখ, ভাই উজ্জ্বল, শত শত বছর ধরে একটা ধারণা চলে আসছে বলেই যে সেটা সত্যি হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এই ধারণাগুলি ধর্মশাস্ত্রের অনুমান বা মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"বল কি সুশান্ত, এগুলি অবিশ্বাস করলে ত' জীবনের কোন মানেই খুঁজে পাওয়া যায় না। একবার জন্মালাম, কিছুদিন পৃথিবীতে রইলাম তার পরেই সব শেষ; একথা ভাবলে জীবন একেবারেই অর্থহীন বলে মনে হয়না কি?"

"তা কেন হবে? প্রকৃতির সব চাইতে বড় সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ জাতি। সৃষ্টির শুরু থেকে যত মানুষ জন্মেছে ও মারা গেছে তাদের সকলেরই কিছু না কিছু অবদান রয়ে গেছে এই মানুষ জাতির মধ্যে। প্রায় প্রত্যেক মানুষই রেখে গেছে সন্তান সন্ততি, যাদের

মধ্যে রয়ে গেছে তাদের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য এবং মহাজনেরা রেখে গেছেন তাঁদের ব্যক্তিত্বের ছাপ এবং কীর্তি। এই ভাবেই হয়েছে মানুষ জাতির ক্রম বিকাশ এবং এখনও হয়ে চলেছে। মানুষ মরে যাবার পরেই তার সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি।

আমরা ছেলেবেলার থেকে বড় হই। যখন বড় হই তখন ছেলেবেলার জীবনের হয় মৃত্যু, না হলে বড় হতে পারতাম না। কিন্তু তাই বলে ছেলেবেলার জীবনটা অর্থহীন নয়। ছেলেবেলার জীবন থেকেই গড়ে উঠেছে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জীবন। তেমনি আমরা মরে যাই বলেই আমাদের জীবন অর্থহীন নয়, আমাদের জীবন থেকেই গড়ে উঠেছে মানুষ জাতি।

প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে ধ্বংস এবং সৃষ্টি। একই সঙ্গে হয়ে চলেছে দুটো কাজ। ধ্বংস না হলে নতুন সৃষ্টি হতে পারতো না। গাছ বড় হয়, ফল দেয়, তারপরে মরে যায় তারপরে কিন্তু থেকে যায় ফলের বীজ যার থেকে আরও গাছ জন্মায়। জন্তু জানোয়ার ও মানুষের বেলায় ঠিক একই জিনিস হচ্ছে, তাতে জীবন অর্থহীন মনে হবার কোন কারণ নেই। মরার পর আত্মা বেঁচে রইল এবং হয় অশরীরী হয়ে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ালো, নয় নতুন শরীর নিয়ে জন্মালো, আগের জন্মের কথা কিছুই মনে রইলনা—একথা ভাবলেই বা জীবনের এমন কি বেশী অর্থ হয় ?

আগের দিনে দেব দেবীর ইচ্ছাকেই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির কারণ বলে মনে করা হত কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি একের পর এক সেই সব ধারণার অবসান ঘটিয়ে চলেছে। সৃষ্টির রহস্যের পৌরাণিক ব্যাখ্যা এখন শিক্ষিত সমাজের ক'জন আর বিশ্বাস করে বলো ?

এই মতবাদগুলি যুগ যুগ ধরে মানুষের ও সমাজের কিছু কল্যাণ সাধন করেছে তা আমি অস্বীকার করি না। আত্মা মৃত্যুহীন এই বিশ্বাস প্রিয়জনের মৃত্যুতে পরলোকে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা মানুষের মনে এনেছে সান্ত্বনা এবং নিজের মৃত্যুর সময়,

মরার পরেও বেঁচে থাকবো এই আশা মৃত্যু ভয়কে লাঘব করেছে।

ভাল কাজ করলে স্বর্গে গিয়ে অনন্ত সুখ ভোগের আশা মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং মানুষ এ জন্মের সুখের ওপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সমাজের বিভেদ নীতির অবিচার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেছে।

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ মেনে নিয়ে মানুষ তার জন্মগত অবস্থা বৈষম্য এবং দুঃখ দুর্দশার জন্য নিজের পূর্বতন জীবনের কর্মফলকেই দায়ী করেছে, তাই তার পক্ষে শ্রেণীভিত্তিক সমাজের অন্যায় অবিচার মুখ বুজে সহ্য করা সম্ভব হয়েছে। তা না হলে সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত, সর্বত্র দেখা দিত অরাজকতা, এবং সভ্যতার গোড়ার দিকে এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মানুষ হয়ত আজ সভ্যতার এই পর্যায়ে উঠতে পারতো না।

আগের দিনের সরল বিশ্বাসী মানুষ বিনা প্রমাণে এই সব মতবাদ বিশ্বাস করতো তাই এগুলো পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃতি পায় এবং একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এই সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে শাসক ও ধর্ম সম্প্রদায় শত শত বছর ধরে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে এসেছে।"

আমি হেসে বলি, "তুমি যে দেখছি একেবারে কমিউনিষ্ট্ হয়ে গেছ।"

"এ কথা বলবার জন্য কমিউনিষ্ট্ হওয়ার দরকার করে না, এটা ত' সাধারণ বুদ্ধির কথা।

ঋষি চার্বাক মহাকাব্যের যুগের লোক হয়েও বলেছিলেন যে পরলোক, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, মোক্ষ এই সমস্ত কথা ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রচার করেছে। তাঁর মতে—

'ন স্বর্গো নাপবর্গ বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥'

অর্থাৎ স্বর্গ, মোক্ষ, আত্মা বা পরলোক বলে কিছু নেই; বর্ণাশ্রম ইত্যাদি কাজেরও কোন ফল নেই।

বেদ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হচ্ছে—

'ত্রয়োবেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ।
জর্ব্বরীতুর্ব্বরী পণ্ডিতানাংবচঃ স্মৃতম্॥'

অর্থাৎ ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর এই তিন রকমের লোকেই বেদ লিখেছে; জর্ব্বরী, তুর্ব্বরী ইত্যাদি অবোধ্য শব্দে বেদ ভর্তি।

চার্বাক দর্শনই ভারতের প্রথম বিচারভিত্তিক দর্শন।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্ল্ মানুষ মরে গেলে আত্মার অস্তিত্ব থাকে একথা স্বীকার করেন নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কাণ্ট্ বলেছেন যে যুক্তি দিয়ে আত্মার অমরতা প্রমাণ করা যায় না তবে নৈতিকতার দিক থেকে এটা স্বীকার করা যায়।"

"বেদ, উপনিষদ সাধারণ মানুষকে শোষণ করবার জন্য এই সব মতবাদ প্রচার করেছিল এটা কিন্তু তোমার ভুল ধারণা সুশান্ত।

বেদ উপনিষদ বলেছে—

'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্।'

অর্থাৎ বিশ্বচরাচর ঈশ্বরে পরিপূর্ণ। অতএব 'ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করবে। পরধনে লোভ করবে না।

'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।'

অর্থাৎ যারা শুধু নিজের জন্য রান্না করে, সেই পাপীরা দুঃখ ভোগ করে।

সর্বজ্ঞ ঋষিরা ধ্যানে বসে এবং পণ্ডিতেরা যুক্তি তর্কের দ্বারা বিচার করে যে জ্ঞান লাভ করেছেন সেই সব জ্ঞানের কথাই বেদ উপনিষদে প্রকাশ পেয়েছে।

আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে, আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে, মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি বা শান্তির উদ্দেশে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, ভজন, দান-ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি কিছু না কিছু অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে—হিন্দুদের যেমন শ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টি। আত্মার অস্তিত্ব না থাকলে এ রকম একটা বিশ্বজনীন নিয়ম কি করে হয়?"

"আমি আবার সেই একই কথা বলবো। একটা সার্বজনীন বিশ্বাস চলে আসছে বলেই যে সেটা সত্যি হতে হবে তার কোন মানে নেই। মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে যে সব ক্রিয়াকলাপের কথা বললে সে সব হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল—মৃত ব্যক্তির জন্য তার প্রিয়জনদের কিছু করার ইচ্ছার থেকেই এ সবের উৎপত্তি। সোজা ভাষায় বলতে গেলে জীবিত লোকেরা নিজেদের মনের শান্তির জন্যই এ সব করে, মৃতের আত্মার সদ্‌গতি বা শান্তির জন্য নয়।

জানো ত' একটা কথা আছে। 'বেঁচে থাকতে দেয় না ভাত কাপড়, মরে গেলে করে দানসাগর।' অনেক সময়ই দেখা যায় যে ছেলেরা তাদের বুড়ো বাপ মার জীবিত অবস্থায় নিজেদের কর্তব্য পালন করেনা, কিন্তু তাঁরা মারা গেলে ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে, গয়ায় পিণ্ডি দেয়, দান খয়রাতে বহু টাকা খরচ করে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে নিজের পূর্বকৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনার থেকে নিস্তার পাওয়া এবং বাপ মার জন্য অনেক কিছুই করেছি এই ভেবে শান্তি পাওয়া।

এ বিষয়ে ঋষি চার্বাক কি বলেছেন জানো? শ্রাদ্ধ কিম্বা পিণ্ডি দেওয়ার সময় পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে খাবার দেওয়া হলে যদি তাঁর তৃপ্তি হত তাহলে বিদেশে গেছে এমন লোকের উদ্দেশে এখানে খাবার দিলে তার পেট ভরেনা কেন? চার্বাকের মতে ধূর্ত ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব আচার নিষ্ঠা

উদ্ভাবন করেছে, কেননা শ্রাদ্ধে এবং যাগ-যজ্ঞে প্রদত্ত জিনিসপত্র তারাই পায়।”

“তুমি যা বললে সেটা যে এই সব ক্রিয়া-কর্মের একটা কারণ তা আমি অস্বীকার করিনা তবে এটাই প্রধান কারণ নয়। যাক এ বিষয়ে তত্ত্ব নিয়ে কচকচি করে লাভ হবে না বরং এ বিষয়ে তোমাকে দু একটা ঘটনা বলি।

এক ভদ্রলোকের ছেলে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে হিন্দুধর্মের আচার-বিচারে আস্থাহীন হয়ে পড়ে। কিছুদিন পরে তার বাবা মারা যান। যদিও আত্মীয়স্বজনের চাপে পড়ে অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সে করে কিন্তু কিছুতেই আর তাকে দিয়ে গয়ায় পিণ্ডি দেওয়ানো গেল না। এদিকে তার বাবার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তিনি মারা যাবার পর যেন গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়।

কিছুদিন পর ছেলেটি স্বপ্ন দেখে যে তার বাবা তাকে পিণ্ডি দিতে অনুরোধ করছেন। তবুও সে পিণ্ডি দিতে রাজী হল না। কিন্তু তারপর থেকে রোজ রাত্রে এই একই স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগলো। তখন নেহাৎ নিরুপায় হয়ে সে গয়ায় গেল পিণ্ডি দিতে।

গয়ায় ফল্গু নদীর তীরে, চাল কলা ইত্যাদি মেখে, মন্ত্র পড়ে যেই সে একটা পিণ্ডি বালুর ওপর রাখতে গেছে অমনি দেখে ওখানে তার বাবার হাত—পিণ্ডি নেবার জন্য তিনি হাত পেতে রেখেছেন। পিণ্ডিটা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা মিলিয়ে গেল।”

সুশান্তর দিকে তাকিয়ে দেখি মুখে ওর অবিশ্বাসের হাসি। ও বলে “এটা একটা হ্যালুসিনেশন্, সম্পূর্ণ সাইকোলজিক্যাল, ওই স্বপ্ন দেখার ফল।

“আচ্ছা, আর একটা ঘটনা বলি, গত বছর নারাণের কাছে শুনেছি। একদিন ও গয়ায় এক আশ্রমের একজন স্বামীজীকে

জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা স্বামীজী, এই যে লোকে কত কষ্ট করে গয়ায় পিণ্ডি দিতে আসে, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এতে সত্যিকারের কোন ফল হয়?'

স্বামীজী জবাব দেন, 'বিশ্বাস কি আর এমনি হয়েছে, বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি।' তারপর স্বামীজী নারাণকে একটা ঘটনা বলেন। ঘটনাটা মোটামুটি এই—একদিন শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ একটি মেয়ের গলা শুনে স্বামীজীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। মেয়েটি বলে সে ও একটি ছেলে কিছুদিন আগে আত্মহত্যা করে মরেছে। তারা দুজনে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু বাপ মা আপত্তি করায় তারা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। তারা বড়ই অশান্তিতে আছে। স্বামীজী যদি তাদের নামে পিণ্ডি দেন তাহলে তারা শান্তি পাবে। তাদের নাম-ধামও মেয়েটি স্বামীজীকে বলে।

সকালবেলা সেই স্বামীজী আর একজন স্বামীজীকে, যিনি তখন পিণ্ডি দেওয়ার ব্যাপার দেখাশুনা করছিলেন, ওই মেয়েটি ও ছেলেটির নামে পিণ্ডি দেবার কথা বলে দেন।

এর প্রায় মাসখানেক পরে আবার একদিন শেষ রাত্রে সেই মেয়েটির গলা শুনে স্বামীজীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। মেয়েটি বলে তখন পর্যন্ত তাদের পিণ্ডি দেওয়া হয়নি এবং তারা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। স্বামীজী জানান যে পিণ্ডি দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটি জোর দিয়ে বলে যে তা হয়নি। সে আবার তার এবং ওই ছেলেটির নাম-ধাম বলে, তাড়াতাড়ি পিণ্ডি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নেয়।

পরের দিন স্বামীজী খোঁজ নিয়ে দেখেন যে মেয়েটির কথা সত্যি, তাদের পিণ্ডি দেওয়া হয়নি। তিনি যাঁকে বলেছিলেন তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তখন স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিণ্ডি দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। মেয়েটি মহারাষ্ট্রের ঠিকানা দিয়েছিল। পরে স্বামীজী মহারাষ্ট্রে তাঁর এক বন্ধুর কাছে এই ব্যাপারে খবর নেবার

জন্য চিঠি লেখেন এবং জবাবে জানতে পারেন যে মেয়েটি তাঁকে সত্যি কথাই বলেছিল।

আমিও গয়াতে আমার বাবা মার পিণ্ডি দিয়েছি। ওখানকার আবহাওয়া এবং পাণ্ডাদের হালচাল দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে যে পিণ্ডি দিলেই আত্মার সদ্‌গতি হবে একথা বোধ হয় অর্থহীন। কিন্তু একটা কথা কি জানো সুশান্ত, সবই হচ্ছে মানুষের মনের ব্যাপার। মৃত্যুর পর মানুষের মনের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। তাই জীবিত অবস্থায় যে মনে করে যে মরার পর পিণ্ডি না দিলে আত্মার সদ্‌গতি হয় না, মৃত্যুর পরেও তার সেই ধারণাই থাকে। তাই যতক্ষণ তার পিণ্ডি দেওয়া না হয় ততক্ষণ সে অশান্তি ভোগ করে।"

সুশান্ত চুপ করে থাকে। আমি আবার বলতে শুরু করি, "এবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক থেকে আত্মার শরীর থেকে স্বতন্ত্র সত্তার বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

কিছু লোক বাস্তব জীবনেই শরীর থেকে নিজের বা আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করেছেন। এ সম্পর্কে তোমাকে কয়েকটি ঘটনা বলছি।

"এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্' বইটা পড়েছো? আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখা, যিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।"

"পড়েছি, অনেকদিন আগে।"

"বইটির নবম পরিচ্ছেদে গল্পের নায়ক ট্রেঞ্চের মধ্যে আহত হয়ে কি বলছেন শোনো"—বলে বইটা নিয়ে পড়তে শুরু করি।

"I tried to breathe but my breath would not come and I felt myself rush bodily out of myself and out and out and out and all the time bodily in the wind. I went out swiftly, all of myself,

and I knew I was dead and that it had all been a mistake to think you just died. Then I floated, and instead of going on I felt myself slide back I breathed and I was back'."[১]

(আমি নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না এবং উপলব্ধি করলাম যে আমি যেন শরীরটা নিয়ে আমার থেকে সবেগে বেরিয়ে পড়েছি বাইরে, বাইরে, বাইরে প্রবহমান বাতাসের মধ্যে এবং সারাক্ষণ সশরীরে। আমি দ্রুতবেগে বেরিয়ে এসেছি, পুরোপুরি আমি, বুঝতে পারলাম যে আমি মরে গেছি এবং এও বুঝলাম যে মরে গেছি সেটা মনে করাও ভুল। তারপর আমি ভাসতে লাগলাম এবং অনুভব করলাম যে এগিয়ে যাওয়ার বদলে গড়িয়ে পড়ছি। আমি শ্বাস নিলাম এবং ফিরে এলাম।)

"এতে কি প্রমাণ হচ্ছে? এ ত' লেখকের কল্পনা মাত্র।" আমার পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুশান্ত বলে ওঠে।

"এটা কল্পনা নয়, এটা হেমিংওয়ের নিজস্ব অভিজ্ঞতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অ্যামেরিকান একটি অ্যামবুলেন্স ইউনিটে যোগ দিয়ে হেমিংওয়ে ইটালি গিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই রাত্রে, কামানের গোলা লেগে তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন এবং সেই সময় তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়।[২]

১। 'A Farewell to Arms'—Ernest Hemmingway, Bantam Edition, 1955. Page 41.

২। 'The Enigma of out-of-Body Travel'—Sussy Smith. (A Signet Mystic Book). Published by the New American Library. Page 18.

স্যার্ অ্যালেগ্জ্যান্ডার অগস্টন কে. সি. ভি. ও, তাঁর এরকম একটা অভিজ্ঞতার কথা 'রেমিনিসেন্সেস্ অভ্ থ্রী ক্যাম্পেইন্স্'-এ লিখেছেন।

স্যার্ অ্যালেগ্জ্যান্ডার টাইফয়েড হয়ে ব্লোমফন্টেইন্ হাসপাতালে ছিলেন। অবস্থা তাঁর খুবই খারাপ, দিন রাত্রি মোহের ঘোরে পড়ে থাকতেন। সেই সময় তাঁর মনে হত তাঁর মন ও শরীর দুটো যেন আলাদা। ঠাণ্ডা জড়পিণ্ডের মত শরীরটা যদিও নিজের বলে ভাবতেন কিন্তু মনে হত উনি যেন সেটা নন। তিনি নিজে অর্থাৎ তাঁর মনটা সময় সময় শরীর ছেড়ে বাঁ হাতে কি যেন একটা নরম কালো জিনিস নিয়ে সূর্যহীন, চন্দ্রহীন, তারাহীন ধূসর আকাশে দিগন্তের মৃদু আলো লক্ষ্য করে ঘুরে বেড়াতেন। যদিও নিঃসঙ্গ তবুও তাঁর খারাপ লাগতোনা এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য কালো কালো ছায়া ঘুরে বেড়াতে দেখতেন। সময় সময় আবার তিনি বিরক্তির সঙ্গে নিজের শরীরে প্রবেশ করতেন।

এই ঘোরাঘুরির সময় তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করতেন যে দেওয়াল টেওয়ালের মধ্য দিয়েও তিনি সব কিছু দেখতে পেতেন।

একদিন ওই হাসপাতালেই তিনি একজন আর. এ. এম. সি. স্যার্জন্কে যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে মারা যেতে দেখলেন এবং পরের দিন তাকে কবরখানায় নিয়ে যেতেও দেখলেন।

ধীরে ধীরে স্যার্ অ্যালেগ্জ্যান্ডারের শরীর থেকে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করা কমে গেল। শরীরটাকে তাঁর আর ঠাণ্ডা জড়পিণ্ড মনে হত না এবং ক্রমে দুটো পৃথক সত্তা এক হয়ে গেল।

সুস্থ হয়ে তিনি নার্সদের আর. এ. এম. সি. স্যার্জন্-এর মারা যাবার ঘটনাটা সব বললেন। তিনি যা যা দেখেছিলেন সবই

ঠিক। অথচ এই আর. এ. এম. সি স্যার্জ্ন্-এর কথা তিনি আগে জানতেনও না এবং উনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকে তাকে দেখতে পাবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।[১]

আরও একটা ঘটনা শোনো—১৯২৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী স্যার্ অ্যাক্‌ল্যান্ড্ গেডিস্, রয়াল্ মেডিক্‌ল্ সোসাইটিতে ভাষণ দেবার সময় একজন লোকের এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। চিকিৎসা করে তাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।[২]

একদিন মাঝরাত্রে লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্রমে তার শরীরে বিষের ক্রিয়ার প্রায় সমস্ত লক্ষণই দেখা দেয় এবং পরদিন বেলা দশটায় তার অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক হয়।

হঠাৎ সে অনুভব করে তার যেন দুটো চেতনা—একটা নিজের অহমিকা আর একটা শরীরের। তারপরে মনে হয় শরীরের চেতনাটা যেন মাথা, হৃৎপিণ্ড এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চেতনা দিয়ে তৈরী। একটু পরেই তার আবার মনে হল যে শরীরের চেতনাটা যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ল, আর অহমিকার চেতনাটা সে পুরোপুরি নিজে এবং সেটা শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ক্রমে সে উপলব্ধি করে যে সে পুরো বাড়ী বাগান সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে এবং তারপরেই লক্ষ্য করে যে শুধু তাই নয় যেখানে মন যায় সে জায়গাই তার দৃষ্টি গোচর হয়।

১) 'Reminiscences of Three Campaigns' Part II, Page 222-223.

২) 'Personality of Man'—G. N. M. Tyrrell (Pelican Books). Penguin Books, publisher. 1948. Page 197-199.

তারপর সে দেখে একজন তার ঘরে ঢুকে তাকে দেখে আঁৎকে উঠে টেলিফোনের কাছে গেল এবং তার ডাক্তার অন্য রোগীদের ফেলে তাড়াহুড়ো করে চলে এসে তার শরীরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, কিন্তু শরীরের সঙ্গে যোগ না থাকায় সে উত্তর দিতে পারলো না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার তার শরীরে একটা ইন্‌জেক্‌শান্‌ দিলেন এবং একটা আকর্ষণ বোধ করে সে শরীরে ঢুকে পড়ল।

নিজেদের জানাশোনার মধ্যে একটা ঘটনা বলি। অল্প কিছু দিন আগের ব্যাপার। স্নিগ্ধ সরকারকে তুমি বোধ হয় চেনোনা, আমাদের চাইতে বছর দশেকের জুনিয়র। বেশ কিছু দিন ইন্‌স্টিটিউট্‌ অভ্‌ এঞ্জিনীয়ার্‌স্‌-এর সেক্রেটারী ছিল। ঘটনাটা ওর মিসেস্‌, অর্থাৎ পত্রলেখার মাকে নিয়ে।

পত্রলেখার মা অনেকদিন ধরে হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। ক্রমশ খারাপ হতে হতে ১৯১৯ সালের বারোই জুন, তাঁর অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক হয়। সারাটা দিনই প্রায় তিনি আচ্ছন্নের মত পড়েছিলেন। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় হঠাৎ তিনি জেগে উঠে, 'আমি যাবোনা, আমি যাবোনা, আমার সাজানো সংসার ফেলে যাবোনা, আমার ছেলে মেয়েদের কে দেখবে?' ইত্যাদি বলে কাঁদতে লাগলেন। ডাক্তার তখন তাঁকে ইন্‌জেক্‌শান্‌ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

এর দুদিন পর অর্থাৎ চোদ্দোই জুন, তাঁর অবস্থা একটু ভাল হল। দুপুরবেলা তিনি পত্রলেখার দাদা, বিশ্বজিতকে ডেকে বললেন, 'জানিস বাবাই, ঐ দিন ত' আমি চলেই গেছ্‌লুম—আমি দেখ্‌লুম সিঁড়ির ওপর বসে তুই খুব কাঁদছিস তাই আবার চলে এলুম।'

একথা শুনে ত' সবাই অবাক, বিশেষ করে বিশ্বজিত। বারোই জুন, মা যখন কান্নাকাটি করছিলেন, বিশ্বজিত তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, সকলের আড়ালে সিঁড়িতে বসে কাঁদছিল। তার মার ত' এটা দেখার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, অন্য কেউও দেখেনি, সবাই তখন মাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

এই ঘটনার মাত্র ছয়দিন পরে অর্থাৎ বিশে জুন, পত্রলেখার মা সবাইকে ছেড়ে চলে যান।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে মানুষের আত্মা স্থুল শরীর ছেড়ে ঘুরে আসতে পারে। শরীর থেকে বেরিয়ে গেলেও আত্মার দেখা শোনার ক্ষমতা থাকে এবং ঐ সময় কোন কিছুই আত্মার যাতায়াত বা দেখা শোনার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।"

সুশান্ত বলে, "এ কথা ভাই আমি মানতে পারছি না। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, স্যার্ অ্যালেগ্‌জ্যান্‌ডার অগস্টন এবং আর একজন, যাঁর কথা স্যার্ অ্যাক্‌ল্যান্‌ড্ গেডিস্ বলেছিলেন, এঁরা শরীর ছেড়ে ঘুরে আসার যে ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছিলেন সেটা এঁদের পূর্ববর্তী ধারণা অনুযায়ী কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা যা প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বলেছিলেন সেগুলো খানিকটা তাঁদের অনুমান ও খানিকটা কল্পনা এবং সেগুলি বাই চান্‌স্ বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। মিসেস্ সরকারের মার ব্যাপারটাও তাই, তিনি হয়ত ছেলেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন এবং অনুমান করেছিলেন যে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে কাঁদছিল।

দেখ ভাই উজ্জ্বল, আত্মা শরীর হতে স্বতন্ত্র এবং মৃত্যুর পর আত্মার কি হয় না হয় সবই হচ্ছে অনুমানের কথা, এর কোন প্রমাণ নেই। তুমি বলছিলে যে আত্মা সূক্ষ্ম শরীর সঙ্গে নিয়ে এক শরীর থেকে আর এক শরীরে যায়, এবং সূক্ষ্ম শরীরে নিহিত

থাকে তার আগের আগের জন্মের সংস্কার, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ইত্যাদি। তা যদি হয় তাহলে মানুষের আগের জন্মের কথা মনে থাকেনা কেন?"

"পূর্ব জন্মের স্মৃতি আমাদের সচেতন মনে থাকেনা তাই সাধারণতঃ আমরা তা মনে করতে পারি না। সচেতন মন হচ্ছে মনের এমন একটা অংশ যার কথা আমরা জানি। কিন্তু সচেতন মনই আমাদের পুরো মন নয়, মনের অনেকটা অংশই আমাদের অজানা; যাকে বলা হয় অবচেতন বা অচেতন মন, ইংরেজীতে বলা হয় সাব্‌কনশ্যাস্ ও আন্‌কনশ্যাস্ মাইন্ড্। পুকুরে জলের মধ্যে যেমন একটা স্তর আছে যার ওপরে মাছ উঠলে দেখা যায় নীচে থাকলে দেখা যায়না, মানুষের মনেরও তেমনি একটা স্তর আছে যার ওপরের কথা সে জানতে পারে নীচের কথা জানতে পারে না। মনের সামান্য ভাগই থাকে সচেতন স্তরের ওপর, বেশীর ভাগই থাকে তার নীচে। অচেতন মনটা যে সচেতন মনের থেকে অনেক গুণ বড় শুধু তাই নয়, অচেতন মন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণও বটে। প্রবৃত্তি, আবেগ, ইচ্ছা, প্রেরণা, ধারণা, কল্পনা ইত্যাদি সব কিছুরই উৎপত্তি অচেতন মনে। সচেতন মনের সব কিছুই এসেছে অচেতন মন থেকে এবং অচেতন মনই নিয়ন্ত্রণ করে সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ।

এই অচেতন মনের অসীম ভাণ্ডারে থাকে এ জীবনের শিশুকাল থেকে সমস্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি যার অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে গেছে সচেতন মন থেকে। এই অসীম ভাণ্ডারেই সঞ্চিত থাকে পূর্ব পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি। তবে সাধারণ মানুষ তা মনে করতে পারে না, যোগী ঋষিরা যোগ ও ধ্যানের দ্বারা এটা পারেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন···"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সুশান্ত বলে, "আর পৌরাণিক কাহিনী টেনে এনো না, দোহাই তোমার।"

"বুদ্ধদেব তাঁর পূর্বের সমস্ত জন্মের কথাই মনে করতে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবনী ত' আর পৌরাণিক কাহিনী নয়। অশ্বঘোষের লেখা বুদ্ধের জীবনীর ইংরেজী অনুবাদ করে স্যামুয়েল বিল্ লিখেছেন..." বলে আমি উঠে গিয়ে বইটা এনে পড়ে শোনাই,—

" 'In recollection all former births passed before His eyes. Born in such a place, of such a name, and downwards, to His present birth, so through hundreds, thousands, myriads, all His births and deaths, He knew.' "[১]

(ধ্যানে সমস্ত পূর্ব জন্মের কথা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। অমুক জায়গায় জন্ম, অমুক নামে, পর পর তাঁর বর্তমান জন্ম পর্যন্ত, এই ভাবে শত শত, সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, তাঁর সকল জন্ম ও মৃত্যুর কথাই তিনি জানলেন।)

সুশান্ত বলে, "এটা বুদ্ধদেবের কল্পনা না সত্যি তার কি প্রমাণ ?"

আমি একটু চিন্তা করে বলি, "আচ্ছা তিব্বতে যে কয়েক শ' পুনর্জন্ম প্রাপ্ত লামা আছেন এবং একজন দলাই লামাই যে বারে বারে জন্ম নিয়ে সাড়ে চার শ' বছর ধরে তিব্বত শাসন করে আসছিলেন সে খবর রাখো ?"

"না ত', কি ব্যাপার বল দেখি ?"

"প্রথম দলাইলামা জন্মেছিলেন ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে এবং দেহরক্ষা করে নতুন দেহ ধারণ করে তিনিই আবার দ্বিতীয় দলাইলামা হলেন। এই ভাবেই চলে এসেছে চতুর্দশ লামা পর্যন্ত, যিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে, চীন তিব্বত দখল করার পর ভারতবর্ষে চলে আসেন। দলাই

১। 'Life of the Buddha'—Ashvaghosa, Translated by Samuel Beal.

একটা মঙ্গোল শব্দ যার মানে হচ্ছে সমুদ্র এবং লামা কথাটার মানে হচ্ছে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী; অতএব দলাইলামা হচ্ছেন এমন পুনর্জন্মপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী যাঁর জ্ঞান সমুদ্রের মত অসীম ও গভীর।

ত্রয়োদশ দলাইলামা দেহরক্ষা করার পর চতুর্দশ দলাইলামাকে খুঁজে পাওয়ার ঘটনাটা দলাইলামার আত্মজীবনী থেকে সংক্ষেপে বলি।[১] এরপর আশা করি তোমার আর পুনর্জন্ম সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবেনা।

১৯৩০ সালে, ত্রয়োদশ দলাইলামা দেহরক্ষা করেন। ১৯৩৬ সালে, দলে দলে উচ্চ পদস্থ লামা ও সরকারী কর্মচারীরা চতুর্দশ দলাইলামার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কতগুলি অলৌকিক ঘটনা থেকে তাঁকে কোন দিকে কি রকম জায়গায় ও বাড়ীতে পাওয়া যেতে পারে তার একটা মোটামুটি ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৩৭ সালে, একটি দল, সেরা মঠের লামা যাদের নেতা ছিলেন, সেই বাড়াটা খুঁজে বার করলেন।

সেই বাড়ীতে যাবার আগে দলের সবাই সাজ পোশাক বদলে ফেললেন, লামা এবং অন্যেরা পরলেন চাকরের পোশাক এবং একজন ছোটখাটো কর্মচারী পরলো লামার পোশাক। বাড়ীতে ঢোকার পর বাড়ীর কর্তা সেই কর্মচারীটিকে বসবার ঘরে নিয়ে অন্যদের চাকরদের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে ছিল দুবছরের একটি ছেলে। সে সঙ্গে সঙ্গেই লামাকে চিনতে পেরে কাছে ছুটে এলো এবং অন্যদেরও নাম বলে দিল। শুধু তাই নয়, আগের দলাইলামার ব্যবহার করা জিনিসপত্রও সে চিনতে পারলো। পরে আরও লোকজন এলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে সবাই

নিশ্চিন্ত হলেন যে এই ছেলেটিই দলাইলামা, এর জন্ম তারিখ হল ১৯৩৫ সালের ৬ই জুন।

তিব্বত ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় সময় সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাদের গত জন্মের কথা বলতে শোনা গেছে—গত জন্মে কে ছিল, কোথায় ছিল, কবে মারা গেছে, আত্মীয় স্বজন কে কে ছিল ইত্যাদি। অনেক সময় বাপ মা তাদের কথায় কান দেননি এবং পরে ধীরে ধীরে তারা সে সব কথা ভুলে গেছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বাপ মা তার ছেলে কি মেয়ের কথা উড়িয়ে না দিয়ে তাকে আগের জায়গায় নিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে ঐ ছেলে কি মেয়ে, বাড়ী ঘর এবং গত জন্মের আত্মীয়স্বজন সবাইকে চিনতে পেরেছে এবং আগের জন্মের অনেক ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিয়েছে যা সবই সত্যি। এক ঘটনায় একটি বাচ্চা মেয়ে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের এক ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরে ভীষণভাবে কেঁদেছিল—আগের জন্মে মেয়েটি তার মা ছিল। পরে মেয়েটি সেই বাড়ীর এক জায়গা থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে দিল—যা সে গত জন্মে, ঠেকায় বেঠেকায় দরকার হতে পারে বলে অনেক বছর ধরে জমিয়ে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল এবং হঠাৎ মারা যাওয়ায় সে কথা বলে যেতে পারেনি। ঐ মেয়েটি তার আগের জন্মের বাড়ী ছেড়ে আসতেই চাইছিলনা।

সর্বত্রই এই ধরনের ঘটনা ঘটে এবং কত ঘটনার ত' কোনো খবরই পাওয়া যায় না। অল্প কিছুদিন আগেও ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির প্যারাসাইকোলজি ডিভিশনের অধ্যাপক, ডাঃ আয়ান ষ্টিভেন্‌সন্‌ কতগুলি ঘটনা পরীক্ষা করবার জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এর আগেও তিনি তিনবার এসে গেছেন। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের কতগুলি ঘটনা পরীক্ষা করে তিনি একটা বইও লিখেছেন এবং আরও কয়েকটা লেখার ইচ্ছা রাখেন।" এই বলে

একটু থেমে ড্রয়ার থেকে একটা খবরের কাগজের কাটিং বের করে নিই।

"১৯১৯ সালের ২১শে অক্টোবর, স্টেট্‌স্‌ম্যান-এ এই খবরগুলো দিয়ে কি লিখেছিল শোনো—

'An American professor who has studied more than 500 cases of "rebirth" in different parts of the world feels that it is time that people reckoned with the phenomenon and take the interpretation of reincarnation seriously.'[১]

(একজন অ্যামেরিকান অধ্যাপক, যিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাঁচশ'রও বেশী পুনর্জন্মের ঘটনা পরীক্ষা করেছেন, মনে করেন যে লোকেদের এখন এই ব্যাপারটা গণ্য করার এবং পুনর্জন্মের ব্যাখ্যায় গুরুত্ব আরোপ করবার সময় এসেছে।)

সুশান্ত চুপ করে রইল।

আমি আবার বলতে শুরু করি, "আত্মা শরীর হতে স্বতন্ত্র কিনা, এবং মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা এই বিষয়গুলি আমরা এতক্ষণ দার্শনিক মত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পুনর্জন্মের দিক থেকে বিচার করলাম। এবার মডার্ন স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্‌ এবং সাইকিক্যাল রিসার্চ থেকে যা জানতে পারা গেছে তার থেকে এই প্রশ্নটা বিচার করা যাক।

যারা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব, মানুষের অমরতা ইত্যাদি বিশ্বাস করে এবং পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে তাদের বলা হয় স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌। তাদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপকে বলা হয় স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্‌, যার বাংলা হল আত্মিকবাদ। স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্‌ কথাটা আর এক মানেতেও ব্যবহার

হয় যার বাংলা হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ। এখনকার আলোচনায় কথাটা আমরা প্রথম মানেতেই ব্যবহার করবো।

সবাই পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ করতে পারেন না। কিছু লোক এটা পারেন। তাঁদের বলা হয় মিডিয়াম, কেননা এঁদের মধ্যস্থতায় পরলোক ও ইহলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। মেয়েরাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মিডিয়াম হয় তবে ছেলেরাও যে হয় না তা নয়। স্পিরিচুয়ালিষ্ট্রা এই মিডিয়ামদের সাহায্যেই পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্পিরিচুয়ালিষ্ট্দের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করবার বৈঠককে বলা হয় সীয়ান্স, বাংলায় যাকে বলে প্রেতচক্র এবং যারা সীয়ান্স-এ যোগ দেয় তাদের বলা হয় সিটার।

জ্ঞান লাভের জন্য আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করবার রীতি অনেক দেশেই ধর্মের একটা অঙ্গ হিসাবে বহু পুরাকাল থেকেই চলে আসছিল। যীশুখ্রিস্টের জন্মের হাজার বছরেরও আগে ইস্রায়েলদের প্রথম রাজা সল্, সিদ্ধ পুরুষ স্যামুয়েলের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য এন্ডরের ডাইনীর কাছে গিয়েছিলেন এবং সেখানে স্যামুয়েলের আত্মা মূর্তি ধারণ করেছিল। ওল্ড টেস্টামেণ্টে এর বিবরণ দেওয়া আছে।

পাশ্চাত্য দেশে, মধ্য যুগে, ডাইনী বলে যাদের নির্যাতন করা হয়েছে তাদের কিছু ছিল মিডিয়াম, কিছু হিস্টিরিয়া রোগী আর কিছু সাধারণ লোক। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সর্বত্র এই নির্যাতন চলে এবং প্রায় এক কোটীর কাছাকাছি লোককে ডাইনী বলে মেরে ফেলা হয়। এর পরে ইউরোপে খোলাখুলি ভাবে স্পিরিচুয়ালিজ্মের চর্চা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রায় দেড় শ' বছর পরে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আবার পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার

রীতি মডার্ন স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্‌ বা আধুনিক আত্মিকবাদের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এর শুরু হয় অ্যামেরিকায়, নিউ ইয়র্কের ছোট শহর, হাইডেস্‌ভিলের একটা ভৌতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে, মিঃ জন্‌ ফক্স বলে এক ভদ্রলোক হাইডেস্‌ভিলে একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকতে আসেন।

রাত্রিবেলা হঠাৎ দরজা জানালায় খট্‌ খট্‌ আওয়াজে তাঁদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁরা ভাবেন পুরানো বাড়ীর দরজা জানালা ঢিলে হয়ে গিয়ে হাওয়ায় খট্‌ খট্‌ করছে। কিন্তু জানালা দরজা ঠিক-ঠাক করার পরেও রোজ এ রকম আওয়াজ হতে থাকে, তখন তাঁরা বুঝলেন যে এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার।

একদিন রাত্রিবেলা যখন খট্‌ খট্‌ আওয়াজ হচ্ছিল তখন মিঃ ফক্সের ছোট মেয়ে, কেইট্‌ কয়েকবার আঙুল মট্‌কে ভূতকে উদ্দেশ করে বললো, 'আমি যতবার আঙুল মটকালাম ততবার খট্‌ খট্‌ শব্দ কর দেখি।' মেয়েটি যতবার আঙুল মট্‌কেছিল ঠিক ততবার শব্দ হল। পরে এই মেয়েটি ভূতের সঙ্গে কথা বলবার এক বুদ্ধি বের করে ফেললো। সে এবং তার আর এক বোন এ, বি, সি, ডি করে পর পর এক একটা অক্ষর বলে যায় এবং ভূত যখন খট্‌খট্‌ শব্দ করে তখন সেই অক্ষরটা লিখে ফেলে। এইভাবে সেই ভূতের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেল যে সে ছিল এক ফেরীওয়ালা, যাকে ঐ বাড়ীরই আগের এক বাসিন্দা খুন করে, ঐ বাড়ীতে পুঁতে রেখেছিল। পরে মাটি খুঁড়ে তার কঙ্কাল পাওয়া যায়। এই খবরটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে ও ফক্সদের বাড়ীতে সমানে লোক আসতে থাকে, কেইট্‌ ও তার বোনের সাহায্যে ফেরীওয়ালার আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। কিছুদিনের মধ্যে খবরটা বাইরেও প্রচার হয় এবং পরে কেইট্‌ ও তার বোন মার্গারেটা প্রফেশন্যাল মিডিয়াম হিসাবে অ্যামেরিকা ও ইউরোপে ঘুরে বেড়ায়। এই ঘটনার কথা বহু বিদেশী বইয়ে পেয়েছি, যেমন—মার্টিন ইবনের

এডিট্ করা 'টু একস্‌পীরিয়েন্সেস্ ইন্ কমিউনিকেটিং উইথ্ দি ডেড্', ব্র্যাড্‌স্টিগারের লেখা 'ভয়েসেস্ ফ্রম্ বিয়ণ্ড' এবং 'এন্-সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা' ইত্যাদি।[১]

এর পর থেকেই স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের চর্চা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কেউ মিডিয়ামের মারফৎ পরলোকগত প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে শান্তি পায়, কেউ মরার পরেও বেঁচে থাকবে জেনে আশ্বস্ত হয়, আবার কেউ মরার পর কি হয় না হয় জানবার জন্য স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের চর্চা করে।

ক্রমে এই মডার্ন স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্ একটা নতুন ধর্মের রূপ নেয়। অনেকে অলীক পৌরাণিক কাহিনীর ওপর প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টধর্মের ওপর আস্থা হারিয়ে এই নতুন ধর্ম সম্প্রদায়ে যোগ দেয় এবং ধীরে ধীরে স্পিরিচুয়ালিষ্ট্ চার্চেরও উৎপত্তি হয়।

স্যার্ আর্থার কোনান্ ডয়েল, 'দি হিস্ট্রি অভ্ স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্'-এ কি লিখেছেন শোনো, 'It founds our belief in life after death and in the existence of invisible worlds, not upon ancient tradition or upon vague intuitions but upon proven facts, so that a science of religion may be built up, and may give a sure pathway amid the quagmire of the creeds.'[২]

[এটা (স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্) মৃত্যুর পর জীবনের এবং অদৃশ্য জগতের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে—প্রাচীন ঐতিহ্য কিম্বা অস্পষ্ট উপলব্ধির ভিত্তিতে নয়, প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে—যাতে ধর্মের একটা বিজ্ঞান স্থাপিত হয়ে ধর্মমতগুলির পাঁকের মধ্যে একটা পথ করে দিতে পারে।]

স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌রা ক্রমে ভারতীয় দর্শনের মূল কথাগুলি অর্থাৎ আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা, অমরতা, সূক্ষ্ম শরীরে ভিন্ন লোকে বিচরণ করা, ইত্যাদি মেনে নিয়েছেন ; তবে ধর্মের বা দর্শনের মতবাদ হিসেবে এগুলো তাঁরা মেনে নেননি। আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে এগুলোর সত্যতার প্রমাণ পেয়েই মেনে নিয়েছেন। আধুনিক স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌রা পুনর্জন্মবাদও বিশ্বাস করেন, কিন্তু মানুষের আত্মা যে জন্তু জানোয়ার বা মানুষ ছাড়া অন্য কিছু হয়ে জন্ম নিতে পারে এটা তাঁরা বিশ্বাস করেন না।

কিছু লোক স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের চর্চাকে পুরানো দিনের উইচ্‌ক্র্যাফ্‌ট্‌ ও শয়তান উপাসনার পুনরুত্থান ভেবে এর বিরোধিতা করতে লাগলো। তারা মাঝে মাঝে স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌দের সভা ভেঙ্গে দিতে ও মিডিয়ামদের মারধোর দিতেও কসুর করলোনা। ১৮৫৬ সালে, ড্যানিয়েল ডাংলাস্‌ হোম বলে এক বিখ্যাত মিডিয়াম ইটালিতে স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌দের এক সভায় একটা পিয়ানোকে বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পর কিছু লোক তাঁকে এমন মার মেরেছিল যে তিনি বহুদিন শয্যাগত ছিলেন।

রোমান ক্যাথলিক চার্চও মডার্ন স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের অভ্যুত্থানকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং খ্রিস্টধর্মের প্রভাব খর্ব হতে পারে এই ভেবে উনিশ শতকের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়া পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা নিষিদ্ধ করে দেয়।

কিছু বৈজ্ঞানিক কোন রকম পরীক্ষা না করেই স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌দের সিদ্ধান্তগুলিকে অগ্রাহ্য করতে লাগলেন। ক্লিফোর্ড সোজাসুজি বললেন,—'The universe is made up, of ether and atoms and there is no room for ghosts.'

(বিশ্বচরাচর ইথার ও অ্যাটম দিয়ে তৈরী এবং ভূতের জন্য কোন স্থান নেই।)

মায়ার্স, তাঁর বই, 'হিউম্যান পার্‌সন্যালিটি অ্যান্‌ড্‌ ইট্‌স্‌ সারভাইভ্যাল অভ্‌ বডিলি ডেথ্‌'-এ ক্লিফোর্ডের উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'Clifford had not really turned over his atoms thoroughly enough to make sure that no ghost was hidden among them. As indisputably as any worshipper of Mumbo—Jumbo had that eager truth-lover framed an emotional synthesis which outran his science.' [১]

(ক্লিফোর্ড সত্যসত্যই তাঁব অ্যাটমগুলিকে যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে উল্টেপাল্টে দেখেননি যাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায় যে তার মধ্যে কোন ভূত লুকিয়ে নেই। একজন মাম্‌বো-জাম্‌বো [২] পূজারীর মতই তর্কাতীত ভাবে সেই আকুল সত্যানুরাগী, একটা আবেগপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছিলেন যা তাঁর বিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।)

আমরা সাধারণত ধর্মসম্প্রদায়ের ওপরেই গোঁড়ামীর দোষ চাপাই কিন্তু দেখা যায় যে অনেক বৈজ্ঞানিকও একই দোষে দোষী। কোন অদ্ভুত ঘটনার বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হলে সেই

১) 'Human Personality and its Survival of Bodily Death'—Frederic W. H. Myers Vol. 11, Page 2৬7. Longmans, Green & Co., publisher. 1954.

২) মাম্‌বো-জাম্‌বো—আ্যাফ্রিকার কল্পিত দেবতা বিশেষ।

ঘটনাকেই তাঁরা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তার সত্যতা সম্পর্কে যতই প্রমাণ থাকুক না কেন।

কিন্তু কিছু বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌দের কথা সরাসরি উড়িয়ে না দিয়ে তার সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ, ডাঃ অ্যালফ্রেড রাসেল্‌ ওয়ালেস্‌, যিনি চার্লস্‌ ডারউইনের সঙ্গে 'দি অরিজিন্‌ অভ্‌ স্পিশিজ্‌ বাই ন্যাচার্‌ল্‌ সিলেকশন্‌' সম্পর্কে একত্রে একটা রচনা প্রকাশ করেছিলেন এবং স্যার্‌ উইলিঅ্যাম ক্রুক্‌স্‌, যিনি বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন।

'ক্রুক্‌স্‌ টিউব', 'ক্রুক্‌স্‌ স্পেইস্‌' পড়েছো মনে আছে নিশ্চয়। 'থ্যাল্লিয়াম' এলিমেণ্টটি ক্রুক্‌স্‌ই আবিষ্কার করেছিলেন এবং ব্রিটিশ গভার্নমেণ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পদে পদে ক্রুক্‌সের সঙ্গে পরামর্শ করতো।

১৮৮২ সালে, লণ্ডনে 'সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ' প্রতিষ্ঠিত হল। সাইকি কথাটার মানে হচ্ছে আত্মা কিম্বা মন এবং আত্মাগত ও কিছু মনোগত ব্যাপারের তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান ইত্যাদিকে বলা হয় সাইকিক্যাল রিসার্চ।

এই সমিতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেড্‌রিক ডব্লিউ. এইচ. মায়ার্স, উইলিঅ্যাম ব্যারেট্‌, এড্‌মণ্ড গুর্নি এবং আর্থার ব্যাল্‌ফুর।

মায়ার্স ছিলেন একজন ক্লাসিক্যাল স্কলার এবং ট্রিনিটি কলেজের ফেলো। উইলিঅ্যাম ব্যারেট্‌ একজন ফিজিসিষ্ট্‌ এবং পরে তিনি রয়াল্‌ সোসাইটির ফেলো হন। সুপরিচিত কোয়েকার পরিবারভুক্ত এডমণ্ড গুর্নি হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। আর্থার জেইম্‌স্‌ ব্যালফুর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ব্রিটেনের কনস্যারভেটিভ্‌ পার্টির একজন ক্ষমতাশালী সভ্য ছিলেন এবং ১৯০২ সালে বিলাতের প্রধানমন্ত্রী হন। এই সোসাইটির

প্রথম প্রেসিডেন্ট হেনরি সিজ্‌উইক ছিলেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক।

পরে অ্যামেরিকা ও ইউরোপের নানা জায়গায় এই ধরনের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্যারিসের ইণ্টারন্যাশনাল্‌ মেটাসাইকিক্যাল ইনস্টিটিউট্‌ এদের মধ্যে অন্যতম।

এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হচ্ছে সাধারণ নিয়মের বাইরে মানুষের কিছু অভিজ্ঞতার ও ক্ষমতার কারণ ব্যাখ্যা করা, মিডিয়ামদের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা এবং আপনা আপনি যে সব ভৌতিক ঘটনা ঘটে তার তদন্ত করা।

প্রথমে ঘুমের কথা আলোচনা করা যাক। এর কিছু কিছু পেয়েছি এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা থেকে। আমরা সারা দিন রাত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় ঘুমিয়ে কাটাই। ঘুমের সময় শরীর নিক্রিয় হয়ে পড়ে, মাংসপেশী শিথিল হয়ে যায়, চেতনা হ্রাস পায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া কমে যায়। শরীরের ভিতরকার যন্ত্রপাতির কাজ মোটামুটি অব্যাহত থাকে, কিছু যন্ত্রের কাজ সামান্য কমলেও কিছু যন্ত্রের কাজ আবার বেড়ে যায়। ঘুমের শরীরের গ্লানি ও ক্লান্তি দূর করবার এক বিশেষ ক্ষমতা আছে, চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে থাকলে যা হয় না। ঘুমের সময় শরীরের তাপ প্রায় এক ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট কমে যায়, রক্ত খানিকটা অপরিষ্কার হয় এবং জাগ্রত অবস্থার থেকে ঘাম বেশী হয় কিন্তু হাতের চেটো ও পায়ের তলার ঘাম কমে যায়।

ঘুমের মধ্যে সাধারণত মানুষ নড়া চড়া করে ও পাশ ফেরে, এতে সারা রাত্রে প্রায় চার মিনিট সময় যায়। ঘুম এক সময় গভীর ও এক সময় পাতলা হয়। একই রাত্রে কয়েকবার নিয়মিতভাবে ঘুম গভীর ও পাতলা হয়। ছোটদের বেলায় পঞ্চাশ থেকে ষাট মিনিট

পর পর এই পরিবর্তন হয় বড়দের বেলায় হয় আশি থেকে নব্বই মিনিট পর পর।'

ঘুমের মধ্যে আমরা স্বপ্ন দেখি, এবং স্বপ্ন দেখার সময় চোখ বেশ নড়াচড়া করে. যাকে বলা হয় র‍্যাপিড্ আই মুভ্মেন্ট। এক একটা স্বপ্ন পাঁচ মিনিট থেকে পঞ্চাশ মিনিট স্থায়ী হয় এবং এক রাত্রে আমরা প্রায় ছুঘণ্টা স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখার কয়েক মিনিট পরেই আমরা সাধারণত স্বপ্নের কথা ভুলে যাই যদিনা স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠি। কিন্তু কাউকে হিপ্নটাইজ করে স্বপ্নের কথা মনে রাখতে বললে সে স্বপ্নের কথা ভোলে না। কেউ কেউ বলেন যে তাঁরা স্বপ্ন দেখেন না, কিন্তু সকলেই ঘুমের মধ্যে নিয়মিত ভাবে স্বপ্ন দেখেন। কাউকে যদি ঘুমোতে না দিয়ে জোর করে একটানা জাগিয়ে রাখা হয় তাহলে সে আড়াই দিন থেকে চারদিন পরে জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখবে।

ঘুমোবার সময় পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, সচেতন ও অচেতন মনের ইচ্ছা, কামনা বাসনা, চিন্তা, কল্পনা এবং বর্তমান ও অতীত জীবনের অভিজ্ঞতাই সাধারণত স্বপ্নের উপাদান যোগায়। ঘুমের মধ্যে খাবারের গন্ধ নাকে গেলে খাওয়া দাওয়ার স্বপ্ন দেখা এবং কোন কিছু পোড়ার গন্ধ পেলে আগুনলাগার স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক। ঘণ্টার আওয়াজ কানে গেলে সেই শব্দকে কেন্দ্র করে অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এক একজন এক এক রকম স্বপ্ন দেখে। কেউ এটাকে মন্দিরের ঘণ্টা মনে করে মন্দির সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখে, কেউ চার্চের ঘণ্টা ভেবে দেখে বিয়ের স্বপ্ন। কেউ দেখে রেল ভ্রমণের, কেউ আগুন লাগার। কেউবা আবার দেখে পরীক্ষার স্বপ্ন—ঘণ্টা পড়ে গেল, অথচ কিছুই লেখা হল না ইত্যাদি। ঘুমের মধ্যে কারো দুই পায়ের তলার সামনের দিকে পর পর চাপ দিলে দৌড়াবার স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক।

ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, তা সচেতন মনেরই হোক বা অচেতন মনেরই হোক, স্বপ্নের ওপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগী দেখে চপ কাটলেট খাবার স্বপ্ন, প্রবাসী দেখে বাড়ী ঘরের স্বপ্ন। যে জিনিস ঘটতে পারে ভেবে আমরা ভয় পাই তা-ও আমরা স্বপ্নে দেখি। ফ্রয়েডের মতে প্রায় প্রত্যেক স্বপ্নই বাধাপ্রাপ্ত ও ব্যর্থ অবৈধ আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ বা পরিপূরণের প্রয়াস। অনেক সময় এগুলি খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ পায় না ছদ্মবেশে প্রকাশ পায়।

একটি ছেলে স্বপ্নে প্রায়ই শাঁখের আওয়াজ শুনতো। সাইকো-অ্যানালিসিস্ অর্থাৎ মনোবিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে ছেলেটি এক সময় কোন মেয়েকে শাঁখ বাজাতে দেখেছিল এবং মেয়েটির ওপর তার আসক্তি জন্মেছিল, কিন্তু স্বপ্নে মেয়েটিকে না দেখে শুধু শাঁখের আওয়াজই শুনতো।

এক ভদ্রলোক প্রায়ই বাড়ীতে আগুনলাগার স্বপ্ন দেখতেন, সাইকোঅ্যানালিসিস্ করে দেখা গেল যে তাঁর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু কামনাই এই স্বপ্নে প্রকাশ পেয়েছে। কোন সময় অতীতের অভিজ্ঞতা যার স্মৃতি সচেতন মন থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে তা-ও স্বপ্নে পরিষ্কার দেখা যায়।

কোন সময় আবার পুরাতন এবং সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে অদ্ভুত ও উদ্ভট স্বপ্ন দেখা যায়, কিন্তু ঘুমোবার সময় মানুষের যে ব্যক্তিত্ব বিরাজ করে তার কাছে সবই সত্যি বলে মনে হয়। স্বপ্নে যা দেখি তা সবই বর্তমান ঘটনা হিসাবে দেখি, স্বপ্নে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। স্বপ্নে যে দৃশ্য, লোকজন ইত্যাদি দেখা যায় তা বেশীর ভাগই ধূসর, খুব কম সময়ই রঙ্গীন জিনিস দেখা যায়।

স্বপ্নের এই ব্যাপারগুলি এবং এই ধরনের স্বপ্নগুলি হচ্ছে স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু স্বপ্ন মনের জ্ঞানের বাইরে সত্য ঘটনার

সঙ্গে মিলে যায়—যেমন ধর কেউ স্বপ্ন দেখলো যে তার কোন আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব কেউ মারা গেছে, বা অসুস্থ হয়ে পড়েছে অথবা কোন বিপদে পড়েছে এবং পরে জানতে পারলো যে স্বপ্নে যা দেখেছিল তা সত্য। এই ধরনের স্বপ্নগুলিকে স্বাভাবিক বলা চলে না। আমরা অনেক সময় এগুলোকে চান্‌স্ কোইন্‌সিডেন্‌স্ বা হঠাৎ মিলে যাওয়া ঘটনা বলে উড়িয়ে দিই কিন্তু সব সময় তা ঠিক নয়। কেউ অসুখে ভুগছে খবরটা যদি জানা থাকে এবং তারপর স্বপ্নে দেখা যায় যে সে মারা গেছে, সেটাকে চান্‌স্ কোইন্‌সিডেন্‌স্ বলা চলতে পারে কিন্তু কোন রকম অসুস্থতার খবর না পেয়ে যদি মারা যাবার স্বপ্ন দেখা যায় সেটাকে চান্‌স্ কোইন্‌সিডেন্‌স্ বলা চলে না।

রাইট অনর‍্যাব্‌ল্ স্যার্ জন ড্রামণ্ড হে, কে. সি. বি, জি. সি. এম. জি, একদিন রাত্রে ঘুমাতে ঘুমাতে হঠাৎ তাঁর পুত্রবধূর গলা শুনে জেগে গেলেন। তিনি যেন গভীর দুঃখের সঙ্গে বলছেন, 'ও, বাবা যদি রবার্টের অসুখের কথা জানতেন!' কথাটা এত স্পষ্ট শুনেছেন যে স্যার্ জন ড্রামণ্ড উঠে বসে তাঁর পুত্রবধূর পায়ের আওয়াজের অপেক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু কোন আওয়াজ নেই। স্যার্ জন ড্রামণ্ড ছিলেন ট্যানজিয়ারে এবং তাঁর পুত্রবধূ ছিলেন প্রায় তিন শ' মাইল দূর মগোডোরে। স্যার্ জন ড্রামণ্ড তখন ব্যাপারটাকে হ্যালুসিনেশন ভেবে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুমাতে না ঘুমাতেই আবার সেই এক কথা শুনে তিনি জেগে গেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জাগিয়ে স্বপ্নের কথা বললেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে পুত্রবধূর চিঠিতে জানা গেল যে স্যার্ জন ড্রামণ্ডের ছেলের টাইফয়েড হয়েছিল এবং যে রাত্রে তিনি তাঁর পুত্রবধূর কথা শুনতে পেয়েছিলেন সেই রাত্রে তাঁর ছেলের অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। পরে আরও জানা গেল যে তাঁর পুত্রবধূ

নাকি তখন বারবারই ওই কথা বলছিলেন যা স্যার্ জন ড্রামণ্ড শুনতে পেয়েছিলেন।[১]

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন আগেই স্যার্ জন ড্রামণ্ড ছেলে ভাল আছে এই খবর পেয়েছিলেন। অতএব হঠাৎ এরকম একটা স্বপ্ন দেখবার কোন কারণ নেই।

এই ধরনের ঘটনার একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে টেলিপ্যাথি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া দুটো মনের যোগাযোগ এবং এ ক্ষেত্রে দুটোই জীবিত ব্যক্তির মন।

এবার শোনো আর এক ধরনের কয়েকটা ঘটনা।

ভারতবর্ষেই ফিরোজপুরে এক রাত্রে মিসেস্ রিচার্ডসন্ আধা ঘুম আধা জাগা অবস্থায় হঠাৎ দেখলেন যে প্রায় দেড়শ' মাইল দূরে মূলতানের যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত অবস্থায় তাঁর স্বামী মেজর জেনার্ল্ রিচার্ডসন্‌কে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তিনি যেন বলছেন 'আমার আঙুল থেকে এই আংটিটা খুলে ফেলে আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দাও।' মেজর জেনার্ল্ রিচার্ডসন্ অবশ্য শেষ পর্যন্ত মারা যাননি এবং পরে তাঁর কাছ থেকে এবং যে অফিসার তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর কাছ থেকে জানা গেল যে মিসেস্ রিচার্ডসন্ যে সময় ঐ স্বপ্ন বা ভিশ্‌ন্ দেখেছিলেন ঠিক সেই সময়ই ঐ ঘটনা ঘটেছিল। ভদ্রমহিলা আংটির বিষয় রিচার্ডসন্‌কে যা বলতে

১) 'Society for Psychical Research Journal'—Vol. V, Page 40.

'Human Personality and its Survival of Bodily Death'—Frederic W. H. Myers Vol. I, Page 395. Longmans, Green & Co., publisher. 1954.

শুনেছিলেন ঠিক সেই কথাই রিচার্ডসন্ সেই অফিসারকে বলেছিলেন।[১]

নর্থ আয়ারল্যাণ্ডের নিউরি বলে এক জায়গায় মিসেস্ গ্রীন্ নামে এক ভদ্রমহিলা স্বপ্ন দেখলেন যে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে শুধু দুজন ভদ্রমহিলা যাচ্ছেন। যেতে যেতে ঘোড়াটা একটা নদীর ধারে জল খেতে গিয়ে পা হড়কে গাড়ী নিয়ে জলে পড়ে যায়। ভদ্রমহিলা দুজন দাঁড়িয়ে পড়ে সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে করতে গাড়ী শুদ্ধ ডুবে যায়।

মিসেস্ গ্রীন্ ঘুমের মধ্যেই 'ওদের কি কেউ সাহায্য করবার ছিলনা?' বলে কেঁদে ওঠেন ও তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁর স্বামী 'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করায় উনি স্বপ্নের কথা বলেন। গাড়ীর মধ্যে ভদ্রমহিলাদের কাউকে চিনতে পেরেছেন কিনা তাঁর স্বামী এ কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে তাদের তিনি আগে কোন দিন দেখেননি।

কিছুদিন পরে মিসেস্ গ্রীন্ অষ্ট্রেলিয়া থেকে তাঁর ভাইয়ের চিঠিতে জানলেন যে তাঁর ভাইয়ের মেয়ে ও আর একজন ভদ্রমহিলা গাড়ী জলে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেছেন—উনি স্বপ্নে যে রকম দেখেছিলেন ঠিক সে ভাবে এবং ঘটনাটা যখন ঘটে সেই সময় তিনি স্বপ্ন দেখেন। মিসেস্ গ্রীন্ তাঁর ভাইয়ের মেয়েকে কখনও দেখেননি।[২]

আমার জানাশোনার মধ্যে দুটো ঘটনা বলি। প্রথমটা আমার পরিচিত এক ভদ্রমহিলার নিজের অভিজ্ঞতা, এই সেদিন তাঁর কাছে

১) 'Phantasms of the Living'—E. Gurney, F. W. H Myers, F. Podmore. Vol. 1. Page 443.

২) 'Society for Psychical Research Proceedings' Vol. V. Page. 420.

শুনেছি। বছর বিশেক আগে ঘটনাটা ঘটেছে। আর একটা তাঁর বাবার ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা। ভদ্রমহিলা কলকাতায় এক মেয়েদের কলেজের অধ্যাপিকা। নিজের নাম প্রকাশ করতে তাঁর বিশেষ আপত্তি, এমন কি কলেজের নাম প্রকাশ করতেও তিনি রাজী নন। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন তিনি অবিবাহিতা ছিলেন, তাই তাঁর নামের জায়গায় মিস্ এক্স্ কথাটা ব্যবহার করবো।

১৯৫১ কি ৫২ সালে মিস্ এক্স্ অধ্যাপিকাদের এক বিরাট দলের সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত এক অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য দিল্লী যান। দলের নেত্রী ছিলেন তাঁরই কলেজের অধ্যক্ষ, ধর, মিস্ ওয়াই। ওসমানিয়া কলেজে তাঁদের থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর মিস্ একস্, মিস্ ওয়াই ও আরও কয়েকজন অধ্যাপিকা ঠিক করলেন যে তাঁরা কয়েকদিন দিল্লীতে থেকে যাবেন এবং কিছু অধ্যাপিকা ঠিক করলেন যে তাঁরা আগেই ফিরে যাবেন কলকাতায়। যাঁরা ফিরে যাবেন তাঁরা মিস্ ওয়াই-এর কাছে তাঁদের রিটার্ন টিকেটগুলি চাইলেন। টিকেটগুলো সব তাঁর কাছে ছিল, সবশুদ্ধ বাহান্নখানা। কিন্তু মিস্ ওয়াই ত' আর টিকেট খুঁজে পাননা। তিনি সেগুলো একটা বটুয়ার মধ্যে রেখেছিলেন। স্যুটকেস্, আলমারী, দেরাজ সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব জায়গায়ই তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন তিনি, কিন্তু কোথাও নেই সেই বটুয়া। বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন মিস্ ওয়াই, এতগুলো টিকেট। সবাই মিলে সারাদিন অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলনা টিকেটগুলি।

রাত্রিবেলা, মিস্ এক্স্ প্রথম রাত্রেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি যেন ডাঃ জেড্-এর ঘরে গেছেন টিকেট খুঁজতে খুঁজতে। সেখানে অন্য আসবাবপত্রের মধ্যে তাঁর নজরে পড়ল একটা লোহার সিন্দুক দেওয়ালে গাঁথা, আগের দিনে যেমন থাকত। সিন্দুকের

দরজা খোলা কি বন্ধ ছিল তা তাঁর খেয়াল নেই কিন্তু তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন তার মধ্যে রয়েছে মিস্ ওয়াই-এর সেই বটুয়া। তিনি এর আগে কোনদিন ডাঃ জেড্-এর ঘরে যাননি।

ঘুম ভেঙ্গে গেল মিস্ এক্স্-এর। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি মিস্ ওয়াই-এর দরজায় ধাক্কা দিলেন। মিস্ ওয়াই ত' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন 'কে? কে?'

মিস্ এক্স্-এর পরিচয় পেয়ে বলেন, 'এত রাত করে কি হল তোমার? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?'

মিস্ এক্স্ আমতা আমতা করে বলেন, 'না না। ঐ টিকিটের বটুয়াটা ··আমার মনে হচ্ছিল·· একবার ডাঃ জেড্-এর ঘরটা···'

দরজা না খুলেই, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মিস্ ওয়াই বলেন 'ওহো তুমি সেই টিকেটের কথাই ভাবছো। এত রাত্রে ডাঃ জেড্-এর দরজা ধাক্কালে তিনি কি মনে করবেন? যাও যাও ঘুমিয়ে পড় গিয়ে। টিকেটের কথা নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিয়োনা। কাল দিনের বেলায় দেখা যাবে।"

মিস্ এক্স্ তবুও বলেন, 'একবার খুলুন না দরজাটা।'

নিরুপায় হয়ে দরজা খোলেন মিস্ ওয়াই।

মিস্ এক্স্ বলেন, 'আচ্ছা ডাক্তার জেড্-এর ঘরে টেবিলের পাশে কি একটা লোহার সিন্দুক আছে? দেয়ালের ভেতর গাঁথা?'

এই কথায় মিস্ ওয়াই-এর হাবভাব যায় সম্পূর্ণ বদলে। তিনি আর কোন কথা না বলে ছুটলেন করিডর দিয়ে, মিস্ এক্স্ গেলেন তাঁর পেছন পেছন।

ডাক্তার জেড্-এর ঘরের সামনে গিয়েই মিস্ ওয়াই দুম্ দাম করে দরজা ধাক্কাতে শুরু করলেন। ডাক্তার জেড্ ত' ভয় পেয়ে 'কে? কে?' বলে চীৎকার করে উঠলেন। তারপর পরিচয় পেয়ে দরজা খুলে বলেন, 'কি হল? কারো অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?'

মিস্ এক্স্ চারদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যান, ঠিক এই ঘরই তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন।

মিস্ ওয়াই কোন কথা না বলে সোজা এগিয়ে যান সিন্দুকের দিকে, হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে এক টানে খুলে ফেলেন তার দরজা। সামনেই রয়েছে তাঁর টিকেটের বটুয়া। দিল্লী এসে মিস্ ওয়াই প্রথমেই বটুয়াটা ডাক্তার জেড্-এর ঘরে এই সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলেন। এবং পরে সে কথা বেমালুম ভুলে যান।

এবার শোনো মিস্ এক্স্-এর বাবার অভিজ্ঞতার কথা। তিনি জীবিত নেই। ঘটনাটা আমি মিস্ এক্স্-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে যে রকম শুনেছিলেন। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন মিস্ এক্স্-এর বাবার বয়স বছর নয় কি দশ। তাঁরা তখন কলকাতার উপকণ্ঠে দেশের বাড়ীতে ছিলেন। নাম বলা ত' চলবে না তাই তাঁকে আমি মাস্টার 'জি' বলে অভিহিত করবো।

একদিন মাস্টার 'জি'র জ্যাঠামশাই তাঁকে এক জোড়া চটি কিনে দিলেন, আগের দিনের বিদ্যাসাগরি চটি। জুতো জোড়া পেয়ে তাঁর ফুর্তি দেখে কে? সারাদিন কত বার ধুতির কোঁচা দিয়ে মোছেন জুতো দুটো। বেশী পায়ে দিতেও মায়া হয়।

হঠাৎ সন্ধ্যের পর মাস্টার 'জি' দেখেন যে তাঁর একপাটি জুতো নেই। চোখে অন্ধকার দেখেন তিনি। খোঁজ, খোঁজ—চারদিক তন্ন তন্ন করে খোঁজেন, কিন্তু কোথাও নেই—সেই জুতো। দাদা দিদিদের জিজ্ঞাসা করেন কেউ লুকিয়ে রেখেছেন কিনা, কিন্তু না, কেউ লুকিয়ে রাখেনি। জ্যাঠামশাই জানতে পেরে ত' খুব বকুনি দিলেন—'দিলাম একটা ভাল জিনিস এনে তা যত্ন করে রাখতে পারলি না।'

কাঁদো কাঁদো গলায় মাস্টার 'জি' বলেন—'যত্ন ত আমি কম করিনি, কতবার ধুতির কোঁচা দিয়ে মুছেছি।'

রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন মাস্টার 'জি', যে বাইরের ঘরে একটা শেয়াল তাঁর জুতো চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙ্গে যায় তাঁর। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তিনি জ্যাঠামশাইকে ডেকে তোলেন। জ্যাঠামশাই ত' প্রথমেই এক-চোট বকুনি, কিন্তু নিরুপায় হয়ে যেতে হয় ভাইপোর সঙ্গে—সেই বাইরের ঘরে, লণ্ঠন নিয়ে। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে সত্যি সত্যিই এক পাটি জুতো পড়ে আছে। কোন শেয়াল দেখতে পেলেন না তাঁরা, হয়ত তাঁদের পায়ের শব্দ শুনে পালিয়েছে। চটিটার ওপরের চামড়ার বেশ খানিকটা নেই—শেয়াল কুকুরে খেলে যেমন হয়।

এই চারটি ঘটনার প্রথমটায় আধা ঘুম আধা জাগা অবস্থায় মিসেস্ রিচার্ডসনের আত্মা সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে স্থূল শরীর ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনায় ঘুমের মধ্যে মিসেস্ গ্রীনের আত্মা চলে গিয়েছিল নর্থ আয়ারল্যাণ্ড থেকে সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায়, গাড়ী দুর্ঘটনার জায়গায়। তৃতীয় ঘটনায় মিস্ 'এক্স্'-এর আত্মা গিয়েছিল ডাক্তার 'জেড্'-এর ঘরে। এবং চতুর্থ ঘটনায় মিস্ এক্স্-এর বাবার আত্মা গিয়েছিল বাইরের ঘরে।

তা না হলে মিসেস্ রিচার্ডসন্ ও মিসেস্ গ্রীন্ কি করে ঘটনাগুলির এরকম বিশদ খবর পেলেন এবং কি করেই বা মিস্ 'এক্স্' ও তাঁর বাবা জানলেন টিকেটের ও জুতোর খবর?

মৃত্যু পথ যাত্রীদের আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করার ব্যাপারে যে ঘটনাগুলি বলেছিলাম এই ঘটনাগুলিও অনেকটা সেই ধরনের; তফাৎ শুধু এই, যে এই ঘটনাগুলির অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছিল তাঁরা মৃত্যুপথ যাত্রীদের মত আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করেন নি।"

সুশান্ত সন্দেহের সুরে বলে, "কি যেন ভাই, আত্মা শরীর ছেড়ে ঘুরে আসবে এ কি করে হয়?"

আমি জোর দিয়ে বলি, "কেন হবে না? আত্মা যে শুধু শরীর ছেড়ে ঘুরে আসতে পারে তাই নয়, সময় সময় সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীরের রূপে দেখাও যায়, অর্থাৎ একই লোককে দু জায়গায় দেখা যায়। একে ইংরেজীতে বলা হয় বাইলোকেশন্। শোন তবে বাইলোকেশনের কয়েকটা ঘটনা।

ইটালির অ্যারেজোতে অল্‌ফঁস্ দ্য লিগোরি নামে এক পাদ্রী ছিলেন। ১৭৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি, কয়েকদিন তাঁকে সেল্-এ উপোস করে মৌনী অবস্থায় থাকতে দেখা গেল। ২২শে সেপ্টেম্বর সকালবেলা তিনি লোকজনদের বললেন যে তিনি রোমে পোপের কাছে ছিলেন এবং আগের দিন রাত্রে পোপ মারা গেছেন। পরে জানা গেল পোপ চতুর্দ্দশ ক্লিমেণ্ট ২১ তারিখ রাত্রে মারা গেছেন এবং অনেকে—অল্‌ফঁস্ দ্য লিগোরিকে পোপের মৃত্যু শয্যার পাশে দেখেছেন।

১৮৮৬ সালের ১৫ই নভেম্বর রাত্রিবেলা, রেভারেণ্ড ক্ল্যারেন্স গডফ্রে, বিছানায় শুয়ে মনস্থ করলেন যে তাঁর বান্ধবী এক ভদ্রমহিলাকে দেখা দেবার চেষ্টা করবেন। তিনি আগে এ বিষয়ে ভদ্রমহিলাকে কিছু বলেননি।

রেভারেণ্ড গডফ্রে, প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কল্পনা করতে লাগলেন যে তিনি যেন ভদ্রমহিলার ঘরে, খাটের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছেন। প্রায় আট মিনিট এরকম করার পর তিনি পরিশ্রান্ত বোধ করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রিবেলা তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে যেন পরের দিন সকালবেলা তাঁর দেখা হল এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস

করলেন যে আগের দিন রাত্রে উনি তাঁকে দেখতে পেয়েছেন কিনা? ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।' রেভারেণ্ড গডফ্রে তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে?' ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি আপনার পাশে বসেছিলাম।' কথাটা এত স্পষ্ট শুনতে পেলেন রেভারেণ্ড গডফ্রে, যে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেন যে রাত তখন তিনটে চল্লিশ।

এবার শোনো ভদ্রমহিলার অভিজ্ঞতার কথা। রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়; মনে হয় কেউ যেন ঘরে এসেছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি একবার নীচে ঘুরে এলেন। ঘরে ফিরে এসে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে যে রেভারেণ্ড গডফ্রে সিঁড়ির দিকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কোন কিছু দেখবার সময় তাঁর মুখের যে রকম ভাব হত, ঠিক সেই রকম ছিল তাঁর মুখের ভাব। অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন ভদ্রমহিলা, তিন-চার সেকেণ্ড, মোমবাতির আলোয়। তারপর যেই একটু কাছে গেলেন অমনি মিলিয়ে গেল রেভারেণ্ড গডফ্রের মূর্তি।

মিঃ পডমোরের অনুরোধে রেভারেণ্ড গডফ্রে আরও দুই রাত্রে ঐ ভদ্রমহিলাকে না জানিয়ে তাঁকে দেখা দেবার চেষ্টা করেন। তার মধ্যে একবার তিনি ব্যর্থ হন, কিন্তু আর একবার পুরোপুরি সফল হন।[১]

পরমহংস যোগানন্দের 'অ্যটোবাইঅগ্র্যাফি অভ্ এ যোগী'র থেকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা শোনো। পরমহংস যোগানন্দ জন্মেছিলেন ১৮৯৩ সালে। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন তাঁর বয়স ছিল বারো, আর নাম ছিল মুকুন্দ। একটা জরুরী কাজে মুকুন্দের

১) 'Phantasms of the Living'—E. Gurney, F. W. H. Myers, F. Podmore. 2nd Edition. Vol. 1, Page Ixxxi.

বাবা কেদারনাথবাবু বলে এক ভদ্রলোকের কাছে একটা চিঠি দেবার জন্য মুকুন্দকে কাশী পাঠালেন এবং কেদারনাথ বাবুর ঠিকানা জানা না থাকায় কাশীতে তাঁর আর এক বন্ধু স্বামী প্রণবানন্দের কাছে গিয়ে ঠিকানাটা জেনে নিতে বললেন। স্বামী প্রণবানন্দ আগে তাঁর বাবার অধীনে রেলওয়েতে চাকরি করতেন, পরে সাধু হয়ে যান।

কাশীতে স্বামী প্রণবানন্দের বাড়ী গিয়ে বাবার থেকে আনা পরিচয় পত্র দেবার আগেই স্বামী প্রণবানন্দ মুকুন্দকে চিনে ফেললেন এবং বললেন যে তিনি কেদারনাথ বাবুকে খুঁজে বার করবেন। মুকুন্দ ত' অবাক।

পরে চিঠি পড়ে কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ স্বামী প্রণবানন্দ একেবারে চুপ ও স্থির হয়ে গেলেন। মুকুন্দ ত' ভ্যাবাচ্যাকা এবং একটু চিন্তিতও হয়ে পড়ল, তার বাবার বন্ধুর দেখা কি করে পাবে, সে বিষয়ে ত' স্বামী প্রণবানন্দ কিছু বললেন না এই ভেবে।

খানিক পরে স্বামী প্রণবানন্দ চোখ মেলে তাকিয়ে মুকুন্দকে চিন্তা করতে বারণ করলেন এবং বললেন যে সে যাঁকে দেখতে চায় তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন।

আধঘণ্টা পরে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুকুন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং এক ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো যে তিনিই কেদারনাথবাবু। মুকুন্দ ত' তাজ্জব। কেদারনাথবাবুকে কেউ খবর দেয় নি। স্বামী প্রণবানন্দ ত,' সে ছাড়া আর কোন লোকের সঙ্গে কোন কথাই বলেননি। কেদারনাথবাবুও অবাক, স্বামী প্রণবানন্দ তাঁকে কি করে খুঁজে বার করলেন! তিনি গঙ্গা স্নান করে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি স্বামী প্রণবানন্দ গিয়ে ঘাট থেকে তাঁকে ডেকে এনেছেন।"[১]

---

১) 'Autobiography of a Yogi'—Paramahansa Yogananda. Self' Realization Fellowship, publishers. 1959. Page 22—25.

সুশান্ত চুপ করে থাকে। আমি আবার বলতে শুরু করি, "এবার আর এক ধরনের স্বপ্নের কথা বলি, সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের জার্ন্যাল থেকে। মিঃ এ, ই, ডলবেয়ার, একজন লেকচারার, মিস্ ফার্মার, বলে এক ভদ্রমহিলার বাড়ীতে এক রাত ছিলেন। রাত্রিবেলা তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে মিস্ ফার্মারের বাবা, যিনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন, তিনি যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, অথচ তিনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না। মিঃ ডলবেয়ার স্বপ্নের মধ্যেই বললেন, 'আমি কি করে বুঝবো যে আপনিই মিঃ ফার্মার?' 'আপনাকে আমার হাতটা দেখাবো' বলে মিঃ ফার্মার তাঁর বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন এবং মিঃ ডলবেয়ার তাঁর হাত ধরলেন। হাতটা ভীষণ ঠাণ্ডা এবং সেটা ধরেই মিঃ ডলবেয়ারের ঘুম ভেঙ্গে গেল ও খুবই অস্বস্তি বোধ হল। যাই হোক তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং আবার সেই একই স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। ফার্মার আবার তাঁর হাতটা দেখালেন এবং ডলবেয়ার জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কি করে বুঝবেন যে এটা তাঁরই হাত? তখন ফার্মার বললেন 'আমি আমার আঙুলগুলি এইভাবে নড়াবো।' এই বলে তিনি তাঁর আঙুলগুলি দিয়ে এক অস্বাভাবিক ভঙ্গী করলেন। এর পরেই স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়।

পরের দিন সকাল বেলা ডলবেয়ার, মিস ফার্মারকে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। হাতের ব্যাপারটা শুনে মিস্ ফার্মারের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তাঁর বাবাই ডলবেয়ারকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। তাঁর বাবা বাঁ হাতের আঙুলগুলি এক অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে নড়াতে পারতেন এবং এটা ডলবেয়ারের জানবার কথা নয়।[১]

১) 'Society for Psychical Research Journal'—Vol. VIII. Page 123.

'Human Personality and its Survival of Bodily Death'—Frederic W. H. Myers, Longmans, Green & Co., publisher. 1954. Vol. I, Page 434-435.

ব্রাজিলের বারবাসেনায়, প্রফেসার এ. অ্যালেগ্‌জ্যান্‌ডারের এক ভাগ্নের স্ত্রী মারা যাবার পর সেই ভাগ্নে তাঁর স্ত্রীর জিনিসপত্র ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রফেসার অ্যালেগ্‌জ্যান্‌ডারের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। তার প্রায় মাস দুই পরে প্রফেসার অ্যালেগ্‌-জ্যান্‌ডার্ একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে তাঁর ভাগ্নের স্ত্রী এসে তাঁর খাটের পাশে বসে তাঁকে বলছেন 'সিঁড়ির নীচে আমার পুরানো টিনের বাক্সে একটা একবার জ্বালানো মোমবাতি আছে, ওটা আমি আওয়ার লেডি (ভার্জিন্‌ মেরী) র কাছে দেবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।'

পরের দিন সিঁড়ির নীচে পুরানো টিনের বাক্সটা পাওয়া যায়। বাক্সটা পুরাণো কাপড়-চোপড়ে ভর্তি। অনেক খোঁজা খুঁজির পর একবার জ্বালানো মোমবাতিও একটা পাওয়া গেল এবং পরে সেটা চার্চে পাঠিয়ে দেওয়া হল।[১]

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঘুমের মধ্যে আমাদের আত্মা সূক্ষ্ম শরীরে অন্যত্র ঘুরে আসতে পারে এবং অন্য জীবিত কিম্বা মৃত ব্যক্তির আত্মা বা মনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

ঘুমের কথা শেষ হল এবার হিপ্‌নটিক কন্‌ডিশন-এ বা সম্মোহিত অবস্থায় লোকে কি করে না করে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

হিপ্‌নটিষ্ট্‌ অর্থাৎ সম্মোহনকারী 'হুইস্কি টুকু খেয়ে নাও, এটা খেলেই তোমার নেশা হবে ও মাতলামি করবে,' এই বলে এক

১) 'Society for Psychical Research Journal'—Vol. VII. Page. 188.

'Human Personality and its Survival of Bodily Death—Frederic W. H. Myers Longmans, Green & Co., publisher. 1954. Vol. II, Page 346-347.

গেলাস জল দিলে, হিপ্‌নটাইজ্‌ড্‌ লোক জল খেয়ে মাতলামি শুরু করে দেয়।

হিপ্‌নটাইজ করে লোককে দিয়ে অপরাধমূলক কাজও করানো যেতে পারে। হিপ্‌নটিষ্টের সাজেশনে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্র মহিলাকে ছোরা মেরে খুন করেছেন।[১] এক ভদ্রলোক তাঁর কাকী-মাকে জলে আরসেনিক গুলে খাইয়েছেন এবং এক ভদ্রমহিলা তাঁর মাকে রিভলভার দিয়ে গুলি করে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে তাঁর দোষ স্বীকার করে এলেন।

যে ভদ্রমহিলাকে ছোরা মেরে খুন করা হয়েছিল সেটা একটা খড়ের পুতুল।[১] কাকীমাকে খুন করার জন্য যে গুঁড়ো গোলা হয়েছিল সেটা আরসেনিক নয়, আর মাকে গুলি করবার জন্য যে রিভলভার দেওয়া হয়েছিল তাতে গুলি ছিল না।[২] এগুলো সবই পরীক্ষামূলক ঘটনা। এই ক'টা ঘটনাই পেয়েছি মায়ার্সের লেখা 'হিউম্যান পার্‌সন্যালিটি অ্যানড্‌ ইট্‌স্‌ সারভাইভ্যাল অভ্‌ বডিলি ডেথ' বইটায়।

হিপ্‌নটিক ট্রান্‌স্‌-এ লোকে কি করে, পরে আর সেকথা তার মনে থাকে না, কিন্তু আবার হিপ্‌নটাইজ করে সেকথা মনে করতে বললে তা মনে করতে পারে। কোন কোন সময় হিপ্‌নটিক ট্রান্‌স্‌-এ লোকে যা করে স্বপ্নের মধ্যে তা মনে পড়ে যায়।

যে ভদ্রলোক ছোরা মেরে খড়ের পুতুল খুন করেছিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন যে এক ভদ্রমহিলা তাঁকে খুনের অভিযোগ দিচ্ছেন। এতে তার বড়ই অনুতাপ হল এবং হিপ্‌নটিষ্ট্‌কে তিনি একথা জানালেন। হিপ্‌নটিষ্ট তখন তাঁকে আবার হিপ্‌নটাইজ

১) 'Human Personality and its Survival of Bodily Death'—Frederic W. H. Myers, Longmans, Green & Co,. publisher. 1954. Vol. I. Page 129.

২) Ibid. Vol. 1. Page 513,

করে জিনিসটা পরিষ্কার করে দিলেন এবং তাঁর স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হল।[১]

হিপ্‌নটাইজ করে শরীরের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ করা যায়। এসডাইলি, ভারতবর্ষে এভাবে অনেক অপারেশন করেছেন।[২] ডাঃ ব্র্যামওয়েল, লীড্‌স্‌-এ বড় বড় ডাক্তার ও ডেন্টিস্টদের সামনে হিপ্‌নটাইজ করে একজন লোকের পর পর ষোলোটা দাঁত ফেলেছেন।[৩]

অন্যদিকে আবার 'হাতে গরম গালা ঢালছি, ফোস্কা পড়ে যাবে' এই কথা বলে হিপ্‌নটিষ্ট হাতে এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল দিলেও হাতে ফোস্কা পড়তে দেখা গেছে।

হিপ্‌নটিস্ট, সাজেশন দিয়ে এক দিকে ভুলে যাওয়া ছেলেবেলাকার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে আবার অন্যদিকে পুরানো অপ্রীতিকর স্মৃতি মন থেকে মুছে দিতে পারে। সাজেশন দিয়ে লোকের কোন কোন ইন্দ্রিয়ের শক্তির প্রখরতা অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানো যায়।

কাউকে হিপ্‌নটাইজ করে কিছু সময় বা কিছুদিন পরে কোন কাজ করার সাজেশন বা পরামর্শ দিলে যদিও হিপ্‌নটিজ্‌মের ঘোর কেটে যাবার পর সজ্ঞান অবস্থায় সেকথা মনে থাকবে না কিন্তু সময় মত কাজটি সে ঠিকই করবে। এই ধরনের সাজেশনকে

১) 'Human Personality and its Survival of Bodliy Death'—Frederic W. H. Myers, Longmans, Green & Co, publisher. 1954. Vol. 1. Page. 129.

২) Ibid. Vol. 1, Page 470.

৩) Ibid. Vol. I, Page 471.

বলা হয় পোস্ট হিপ্‌নটিক সাজেশন। ছেলে-মেয়ে হবার কয়েকদিন আগে পোস্ট হিপ্‌নটিক সাজেশন দিয়ে পেইন্‌লেস্‌ ডেলিভারি করানো সম্ভব হয়েছে।

পাগলা-গারদে যে সব রোগীদের আত্মহত্যার প্রবণতা আছে রাত্রিবেলা তাদের পাহারা দেওয়া এক কষ্টকর ব্যাপার। সারা রাত নার্সদের জেগে থাকতে হলে তাদের শরীরও খারাপ হয় এবং হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার ভয়ও থাকে। তাই বুরঘোলজ্‌লি হাসপাতালে সাজেসটিব্‌ল্‌ নার্সদের বেছে নিয়ে হিপ্‌নটাইজ করে সাজেশন দেওয়া হত যে রাত্রিবেলা রোগী যদি কোনরকম আওয়াজ করে বা বিছানা ছেড়ে উঠতে যায় তাহলেই তাদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে কিন্তু অন্য কোন সাধারণ আওয়াজে তাদের ঘুম ভাঙ্গবে না। এতে নার্সদের অযথা স্ট্রেইন্‌ হয় না এবং দেখা গেছে যে একজন নার্স ছ'মাস ধরে রাত্রে ডিউটি দিতে পারে।[১]

হিপ্‌নটাইজ করে লোকের নানা রকম মানসিক ও শারীরিক অসুখও সারানো হয়েছে। হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌কে আগে বলা হত মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌, কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অস্ট্রিয়ার এক ডাক্তার, ফ্রাঁজ অ্যাতোঁ মেস্‌মার হিপ্‌নটাইজ করে নানা রকম রোগ, বিশেষ করে হিস্টিরিয়া সারাতেন। মেস্‌মার মনে করতেন তাঁর শরীর থেকে একটা শক্তি, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন অ্যানিম্যাল্‌ ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌, রোগীর শরীরে গিয়ে অসুখ সারাতো। অনেক ডাক্তারেরা তাঁকে যাদুবিদ্যার অপবাদ দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে অস্ট্রিয়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি তখন প্যারিসে চলে যান এবং সেখানেও তাঁর বেশ পসার জমে ওঠে। কিন্তু

১) 'Human Personality and its Survival of Bodily Death'—Frederic W. H. Myers. Vol. I, page 512. Longmans, Green & Co. 1954.

প্যারিসেও অন্য ডাক্তারেরা তাঁকে ভণ্ড ও হাতুড়ে ডাক্তার বলে অপবাদ দিলেন এবং পরে গভার্নমেণ্ট তাঁর প্রাকটিস বন্ধ করে দেয়। ১৮১৫ সালে মেস্‌মার মারা যান।

উনবিংশ শতাব্দীতে জেইমস্‌ ব্রেইড্‌ মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌ নিয়ে চর্চা করেন এবং এর নতুন নামাকরণ করেন হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌। আগে হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌কে প্যারানরম্যাল অর্থাৎ সাধারণ নিয়মের বাইরের ব্যাপার মনে করা হত কিন্তু আজকাল এটাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করা হয়। এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরের থেকেই এ-নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চর্চা বিশেষভাবে বেড়ে গেছে।

হিপ্‌নটাইজ্‌ড্‌ লোকের অদ্ভুত ব্যবহারের যে ঘটনাগুলি আগে বললাম সেগুলি সবই স্বাভাবিক ব্যবহারের পর্যায়ে পড়ল। এবার অস্বাভাবিক ব্যবহারের কথা কিছু বলি।

যাকে কয়েকবার হিপ্‌নটাইজ করা হয়েছে এমন লোককে বেশ কয়েক মাইল দূর থেকে মনে মনে সাজেশন দিয়ে হিপ্‌নটিষ্ট্‌ ঘুম পাড়িয়েছেন এবং সাজেশন দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়েছেন। আধমাইলের বেশী দূর থেকে লোককে হিপ্‌নটাইজ করে হিপ্‌নটিষ্ট্‌ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন।

হিপ্‌নটিষ্ট্‌ যাকে হিপ্‌নটাইজ করেছেন তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হিপ্‌নটিষ্টের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চিমটি কাটলে বা পিন ফুটালে হিপ্‌নটাইজ্‌ড্‌ লোকটি তার শরীরের সেই সেই জায়গায় হাত বুলিয়েছে কিম্বা সেই জায়গায় ব্যথা পাচ্ছে এ কথা বলেছে। হিপ্‌নটিষ্ট্‌ টক, মিষ্টি, ঝাল, তেতো ইত্যাদি নানারকমের জিনিস মুখে দিলে হিপ্‌নটাইজ্‌ড্‌ লোকটি জিনিসগুলির স্বাদের সঠিক বর্ণনা দিয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে হিপ্‌নটিষ্ট্‌ এবং

হিপ্‌নটাইজ্‌ড্‌ অর্থাৎ সম্মোহনকারি এবং সম্মোহিত ব্যক্তির মনের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই যোগাযোগ সম্ভব।

টাইরেলের লেখা, 'দি পার্‌সন্যালিটি অভ্‌ ম্যান' থেকে একটা ঘটনা শোনো। বস্টন সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের রিসার্চ অফিসার, ডাঃ ফ্রাঙ্কলিন প্রিন্স ১৯২১ সালে মেক্সিকো গিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করেছিলেন।

ডাঃ পাগেনস্টেখের বলে নামকরা এক জার্মান ডাক্তার মিকোয়াকানের গভার্নারের এক মেয়েকে হিপ্‌নটাইজ করে তার ইন্‌সম্‌নিয়া সারাতে গিয়ে দেখেন যে ভদ্রমহিলাকে সম্মোহিত অবস্থায় কোন জিনিস হাতে দিয়ে সেটার বিষয় কিছু বলতে বললে তিনি ঐ জিনিসের পুরো ইতিহাস বলতে পারেন। রোম্যান ফোরামের একটা পাথর হাতে নিয়ে তিনি ফোরামের বিশদ বিবরণ দিলেন, যদিও কোথাকার পাথর তা তাঁকে বলা হয়নি।

একবার ওখানে সমুদ্রে একটা বোতল ভেসে আসে এবং তার মধ্যে একটা সীল্‌ করা খাম পাওয়া যায়। ভদ্রমহিলাকে হিপ্‌নটাইজ করে সেই সীল্‌ শুদ্ধ খামটা তার হাতে দিয়ে এ ব্যাপারে সে যা জানে তাকে বলতে বলা হল। ভদ্রমহিলা প্রথমে একজন লোকের চেহারার বর্ণনা দিলেন। তার কপালে ডান দিকের ভ্রুর ওপরে একটা কাটা দাগ আছে, সে কথাও বললেন তিনি। তারপর একটা বড় জাহাজ ডুবে যাচ্ছে এবং ঐ লোকটি একটা চিঠি লিখে বোতলে ভরে জলে ফেলছে এসব ঘটনারও বিশদ বিবরণ দিলেন।

পরে খাম খুলে একটা চিঠি পাওয়া গেল। জাহাজডুবির খবর দিয়ে চির-বিদায় জানিয়ে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন।

নাম দেখে শেষ পর্যন্ত ঐ চিঠির মালিককে বের করা গেল। তিনি তাঁর স্বামীর লেখা চিনতে পারলেন এবং দেখা গেল যে

হিপ্‌নটাইজ্‌ড্‌ অবস্থায় ভদ্রমহিলা পত্র লেখকের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং কপালে কাটা দাগের কথা বলেছিলেন তা সবই সত্যি।[১]

প্যারিসের 'ইন্‌স্টিটিউট্‌ মেটাসাইকিক ইণ্টারন্যাশন্যাল-এর' ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, ডাঃ ইউজিন ওস্টির লেখা বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ 'সুপার নরম্যাল ফ্যাকালটিজ ইন ম্যান'-এ এই ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে।

কোন জিনিস স্পর্শ করে সেই জিনিস সম্পর্কে অথবা সেই জিনিস যাঁরা স্পর্শ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে বলতে পারার ব্যাপারটাকে বলা হয় 'সাইকোমেট্রি' এবং যাঁরা এটা পারেন তাঁদের বলা হয় 'সাইকোমেট্রিষ্ট্‌'।

এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের কি ব্যাখ্যা হতে পারে? একটা জিনিসের মধ্যে ত' আর এত কথা লেখা থাকতে পারে না? তাছাড়া এমনও দেখা গেছে যে একজন লোক কোন একটা জিনিস স্পর্শ করার পরেও তার জীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে তার কথাও সাইকোমেট্রিষ্ট্‌ বলে দিতে পারেন। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে সাইকোমেট্রিষ্ট্‌রা কোন জিনিস স্পর্শ করে সেই জিনিস যারা স্পর্শ করেছে তাদের আত্মার বা মনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন—তা সে জীবিত লোকের মনই হোক বা মৃত ব্যক্তির মনই হোক।

মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে এবং ঘুমের মধ্যে আত্মা যেমন শরীর থেকে বেরিয়ে অন্যত্র ঘুরে আসতে পারে, সম্মোহিত অবস্থায়ও মাঝে মাঝে তা সম্ভব হয়।

---

১). 'The Personality of Man'—G. N. M. Tyrrell. (Pelican Books). Penguin Books, publisher. 1948.

'Proceedings of the American Society for Psychical Research'. Vol. XV and XVI.

এ বিষয়ে 'অমিয় নিমাই চরিত'-এর লেখক, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের একটা পরীক্ষার কথা বলি। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, তাঁদের দেশের বাড়ীতে একদিন তাঁর সব থেকে ছোট বোনকে হিপ্‌নটাইজ করেন। ঐ অবস্থায় তিনি বোনকে পোস্ট অফিসে যেতে আদেশ করেন। পোস্ট অফিস ছিল বাড়ী থেকে প্রায় আধ-মাইল দূরে।

একটু পরেই সে পোস্ট অফিসে পৌঁছে গেছে কিনা জিজ্ঞেস করায় তাঁর বোন জবাব দেয় যে সে পৌঁছে গেছে। শিশিরবাবু তখন তাকে ঘরে কোথায় কি কি ফার্নিচার রয়েছে, টেবিলের ওপর জিনিসপত্র কি আছে না আছে, লোক ক'জন আছে, কে কোথায় বসেছে এবং কে কি করছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করলেন এবং তাঁর বোন প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে গেল।

তারপর মেয়েটির জ্ঞান ফিরে এলে, ঘরে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে শিশিরবাবু সঙ্গে সঙ্গেই পোস্ট অফিসে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন যে তাঁর বোন যা যা বলেছিল সব হুবহু ঠিক।[১]

ঘুম এবং হিপ্‌নটিজম্-এর কথা বললাম এবার হিস্টিরিয়ার কথা কিছু··· ।"

সুশান্ত আমায় থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, "আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে হিস্টিরিয়ার আবার কি সম্পর্ক ?"

"আছে কিছু সম্পর্ক, পরে বলবো।

হিস্টিরিয়া রোগের কতগুলি উপসর্গ বড় অদ্ভুত, যেমন—কোন রকম শারীরিক কারণ ছাড়াই কেউ বোবা হয়ে যায়, কেউ চোখে দেখে না, কেউ কানে শোনে না, কারও হয় প্যারালিসিস্। কারও

১) 'পরলোকের কথা'—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রণীত; পৃষ্ঠা ৪০-৪১, প্রকাশক: শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ, পত্রিকা হাউস, কলিকাতা।

আবার শরীরের কোন কোন অঙ্গ হয়ে যায় অসাড়, যেমন 'গ্লাভ্ অ্যানেস্থেসিয়া' কিম্বা 'স্টকিং অ্যানেস্থেসিয়া', অর্থাৎ হাত-পায়ের মোজা পরবার জায়গাগুলি অসাড়। কোন সময় শরীরের আদ্ধেক-টাই অসাড় হয়ে যায়—যতই চিমটি কাটো, পিন ফুটাও বা লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দাও টেরই পাবে না। পাশ্চাত্যে মধ্যযুগে এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত শরীরের কোন স্থান অসাড় হওয়াটা ছিল উইচ্ কিম্বা ডাইনীর একটা অকাট্য প্রমাণ। কাউকে ডাইনী বলে সন্দেহ হবার পর যদি দেখা যেত যে তার শরীরের কোন স্থানে ছুঁচ ফোটালে সে টের পায় না তাহলে ত' আর কথাই নেই, অমনি তাকে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হত। ভারতবর্ষে ও আরও অনেক জায়গায় আগের দিনে কারও হিস্টিরিয়া হলে লোকে মনে করত যে তার ওপর ভূতে ভর করেছে এবং ভূত তাড়াবার জন্য ওঝার সাহায্য নিত।

এই রোগে কেউ কেউ আবার বিগত জীবনের কথা এমনকি নিজের পরিচয় শুদ্ধ ভুলে যায়, যাকে বলা হয় অ্যাম্নেসিয়া। এই অ্যাম্নেসিয়া ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে আবার বেশ কিছুদিন ধরে এমনকি কয়েক বছরও চলতে পারে। অনেক দিন স্থায়ী হলে এই অবস্থাকে বলা হয় ফিউগ্ স্টেইট্। অ্যাম্নেসিয়া হয়ে কেউ কেউ নতুন একটা জীবন শুরু করেছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। কেউ কেউ আবার কিছুক্ষণ বা কিছুদিন নিজের মত ব্যবহার করে আবার কিছুদিন অন্য একজন লোকের মত ব্যবহার করে। একে বলা হয় ডাব্‌ল্ পার্সন্যালিটি বা যুগল ব্যক্তিত্ব। কোন কোন সময় দুটোরও বেশী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয় যাকে বলে মাল্টিপ্‌ল্ পার্সন্যালিটি।

এসবই হচ্ছে হিস্টিরিয়া রোগীর স্বাভাবিক ব্যবহার। এখন অস্বাভাবিক ব্যবহারের কথা কিছু বলি।

টুলোঁতে বাইশ বছরের এক নাবিকের হিস্টিরিয়া হয় এবং ডাক্তার ফনটাঁ হিপ্‌নটাইজ করে তার চিকিৎসা করেন। নাবিকটি হিস্টিরিয়ার ফলে চোখে খুবই কম দেখত এবং কানেও কম শুনত। ডাক্তার ফনটাঁ একদিন লক্ষ্য করলেন যে তাকে কিছু পড়তে বললে সে লেখার ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পড়ে। তখন তিনি তাকে নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেন।

একদিন তার সামনে একটা পর্দা খাটিয়ে, পর্দার অন্য দিকে পাঁচটা ফটো রাখা হল। ফটোগুলোর মধ্যে একটি ছোট ছেলের ফটো ছিল। নাবিককে ছোট ছেলের ফটোটি বেছে নিতে বলা হল। সে প্রথমে ফটোগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যে ফটোগুলোতে মানুষের মাথা নীচের দিকে ছিল সেগুলো ঘুরিয়ে সোজা করে রাখলো। তারপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ছোট ছেলের ফটোটি বের করে দিল।

আর একদিন অন্ধকার ঘরে একটা বাক্সের মধ্যে নানা রং-এর উল রেখে ঐ নাবিকের হাতটা বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ডাক্তার ফনটাঁ তাকে নীল রং-এর উলগুলো সব বেছে নিতে বললেন। ঘর এত অন্ধকার যে ডাক্তার ফনটাঁ ও তার সঙ্গীরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। নাবিকটি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চারটি নীল রং-এর উল বেছে নিল।[১]

লিয়োঁ-তে একটি উনিশ বছরের মেয়ের পেটের ওপর কোন তাস ধরলে সেটা কি তাস সে বলে দিতে পারতো। নানারকম খাবার জিনিস আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে কোনটার কি স্বাদ তা-ও সে বলে দিত।

১) 'Human Personality and its Survival of Bodily Death' —Frederic W. H. Myers. Vol. I, page 501—502. Longmans, Green & Co. 1954.

পেতেত্যাঁ, একজন নাম করা ডাক্তার, তাঁর বই 'ইলেক্ট্রিসিটে অ্যানিমেইল'-এ এই ঘটনা ও এ-ধরনের আরও অনেক ঘটনা লিখেছেন।[১]

ডাঃ চাউরিন ছিলেন রাশিয়াতে ট্যাম্বফ্ লুন্যাটিক্-অ্যাসাইলামের ডিরেক্টর। তিনি লিখেছেন এক হিস্টিরিয়া রোগিনীর কথা যে চিনি, নুন, কুইনীন, সোডা ইত্যাদি গোলা জলে ভিজান কাগজ বগলে চেপে সেগুলোর স্বাদ বলে দিতে পারতো। মেয়েটি একবার ট্যাম্বফের মেডিক্ল সোসাইটির সদস্যদের সামনে কাপড়ে ঢাকা কাগজে মোড়া ত্রিশটা ফ্লাস্কের কোনটার কি রং বলে দিয়েছিল।[২]

ই. বয়র‍্যাক্ লিখেছেন লুডোভিক্ বলে এক ভদ্রলোকের কথা। অন্ধকার ঘরে তাঁর চোখ বেঁধে কিছু পড়তে দিলে তিনি লেখায় হাত বুলিয়ে তা পড়তে পারতেন। শুধু তাই নয় লুডোভিকের চোখ বেঁধে বয়র‍্যাক্ তার উল্টো দিকে মুখ করে বসে একটা খবরের কাগজের ওপর আঙুল বুলিয়ে গেলে লুডোভিক্ বয়র‍্যাকের কনুই ধরে থেকে তা পড়ে যেতেন। পরে বয়র‍্যাকের খেয়াল হল হয়ত লুডোভিক্ তাঁর মনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাগজ পড়েন। তখন তিনি নিজেও চোখ বুজে কাগজে হাত বোলাতেন কিন্তু লুডোভিক্ তবুও পড়তে পারতেন।[৩]

কেউ কেউ এটাকে ট্র্যান্স্পোজিশন্ অভ্ সেন্সেস্ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের স্থান বিনিময় বলে বলতেন। কেউ কেউ বলতেন যে

১, ২, ৩) 'Thirty Years of Psychical Research' being a Treatise on Metaphysics—Charles Richet, Ph. D., Translated from the French by Stanley De Brath M. Inst. C. E. W. Collins Sons & Co. Ltd, publisher. 1923. Page 185-186. 187,188.

হিস্টিরিয়া রোগীরা সময় সময় অন্য মনের বা আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এবং এই সমস্ত খবর তারা অন্য মনের থেকেই সংগ্রহ করে। পরের ব্যাখ্যাটাই যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়।"

সুশান্ত বলে, "কিন্তু বয়র‍্যাক্ যখন চোখ বুঁজে কাগজের ওপর হাত বুলিয়ে যেতেন তখনও ত' লুডোভিক্ তাঁর কনুই ধরে লেখা-গুলো পড়তে পারতেন, এটা কি করে সম্ভব হয়? বয়র‍্যাকের মনের সঙ্গে যোগাযোগ করেও ত' কি লেখা আছে তা জানার উপায় ছিল না।"

"না, বয়র‍্যাকের মনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটা জানবার উপায় ছিল না; একমাত্র অশরীরী কোন মনের সঙ্গে যোগাযোগ করেই এটা জানা সম্ভব। এ-ধরনের আর একটা ঘটনা তোমায় পরে বলবো, মিডিয়ামদের ক্রিয়া-কলাপ আলোচনা করবার সময়। এখন শোনো মলি ফ্যান্চারের ঘটনা।

মলি ফ্যান্চার্ নামে ব্রুক্লিনের এক ভদ্রমহিলা সম্পর্কে জর্জ্ অ্যাব্রাহাম এইচ. ডেইলি একটা বই লিখেছেন।

ষোল বছর বয়সে মলি ফ্যান্চারের হিস্টিরিয়া শুরু হয়। তার কিছুদিন পরে ঘোড়ার থেকে পড়ে গিয়ে তিনি আহত হন এবং এক বছরের মধ্যেই আবার গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পিছ্লে পড়ে তিনি গুরুতর আঘাত পান। তারপর থেকে হিস্টিরিয়ার প্রায় সব রকম উপসর্গই একের পর এক তাঁর শরীরে দেখা দিতে লাগলো—চোখে না-দেখা, কানে না-শোনা, শরীর অসাড় হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বহু রকম উপসর্গ।

সাতাশ বছর বয়সে একবার তিনি প্রায় এক মাস মোহের ঘোরে পড়েছিলেন। তারপরেই এর আগের নয় বছরের স্মৃতি তাঁর লোপ পেয়ে গেল। অর্থাৎ আঠারো বছর থেকে সাতাশ বছর পর্যন্ত তাঁর জীবনের সব কিছুই তিনি ভুলে গেলেন। এমনকি, তাঁর

রোগের ঐ সময়কার বিশেষ বিশেষ উপসর্গগুলিও চলে গেল। অন্য দিকে আবার ঐ সময় তিনি ভাল ভাল সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি যা শিখেছিলেন তা-ও সব গেলেন ভুলে। কিন্তু ঐ ন' বছর বাদ দিয়ে বাকি জীবনের স্মৃতি তাঁর ঠিকই ছিল।

ব্যক্তিত্বও তাঁর চার রকমের হয় এবং বন্ধু-বান্ধবেরা এক একটা ব্যক্তিত্বের এক একটা নাম দেয়—রৌজ বাড, আইডল, পার্ল এবং রুবি। যখন তাঁর রৌজ বাডের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেত তখন তিনি ছয় বছরের মেয়ের মত ব্যবহার করতেন, বয়স তখন তাঁর প্রায় চল্লিশ।

এ সব হিস্টিরিয়ার সাধারণ ব্যবহারের মধ্যেই পড়ল। কিন্তু মলি ফ্যান্‌চার্ মাঝে মাঝে দূরের ঘটনার বর্ণনা দিতে পারতেন এবং কারও কোন জিনিস হারিয়ে গেলে সেটা কোথায় পাওয়া যাবে তা-ও বলে দিতেন। এই ধরনের বহু ঘটনা জজ্ সাহেব তাঁর বইয়ে প্রকাশ করেছেন।[১]

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে হিস্টিরিয়ার ফিটের মধ্যে মলি ফ্যান্‌চারের আত্মা সময় সময় শরীর ছেড়ে অন্যত্র ঘুরে আসতে পারত।

অ্যামেরিকার 'দি হেরাল্ড' পত্রিকায় একটা অদ্ভুত ঘটনার খবর বেরিয়েছিল। ঘটনাটা মোটামুটি এই: ১৮৯১ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারী, আইওনিয়ার মাইকেল কন্‌লী বলে একজন লোককে জেফারসনদের বাড়ীর বাইরের একটা ঘরে মরে পড়ে থাকতে দেখা

---

১) 'Mollie Fancher: The Brooklyn Enigma. An Atuhentic Statement of Facts in the Life of Mary J. Fancher, the Psychological Marvel of the Nineteenth Century'—Judge Abraham H. Dailey.

যায়। তাঁর মৃতদেহ করোনার হফ্‌ম্যানের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে নোংরা জামা-কাপড় ছাড়িয়ে অন্য জামা-কাপড় পরিয়ে মৃত দেহ কফিনে রাখা হয়। পরে মাইকেল কন্‌লীর ছেলে এসে মৃতদেহ বাড়ী নিয়ে যায়। সেখানে মাইকেল কন্‌লীর এক মেয়ে বাবার মৃত্যুর খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। জ্ঞান হওয়ার পর মেয়েটি জিজ্ঞেস করে যে তার বাবার পুরানো জামা কাপড় কোথায় গেল। সে আরও বলে যে তার বাবা নাকি কালো প্যাণ্ট ও সাদা সার্ট পরে তাকে দেখা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি বেশ কিছু টাকা একটা লাল কাপড়ে জড়িয়ে তাঁর ধূসর রং-এর সার্টের মধ্যে সেলাই করে রেখেছেন এবং টাকাটা এখনও সেখানে আছে। মেয়েটি আবার অজ্ঞান হয়ে যায় এবং জ্ঞান ফিরে আসার পর কেউ যাতে তার বাবার জামা কাপড়গুলি নিয়ে আসে তার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

বাড়ীর লোকে তার কথা বিশ্বাস করে না; কিন্তু জামা কাপড়-গুলি আনলে তার মাথা ঠাণ্ডা হবে ভেবে, ডাক্তার বাড়ীর লোকদের সেগুলো আনতে বললেন। মেয়েটির ভাই তখন হফ্‌ম্যান্‌কে টেলিফোন করে এবং হফ্‌ম্যান্‌ তার অনুরোধ মত পিছনের উঠোন থেকে জামা কাপড়গুলি কুড়িয়ে নিয়ে এসে প্যাক করে রেখে দিলেন। ছেলেটি পরে হফ্‌ম্যানের কাছে গিয়ে তার বোন যা যা বলেছিল সব জানালো। হফ্‌ম্যান্‌ বললেন যে মৃতদেহকে যে জামা কাপড় পরানো হয়েছিল মেয়েটি তার সঠিক বর্ণনাই দিয়েছে। অথচ ঐ মেয়েটি বা বাড়ীর কারও সেটা জানবার কথা নয়, ছেলেটিও জানতনা, কেননা বন্ধ করা কফিনের ঢাকনার ফুটো দিয়ে মৃতদেহের শুধু মুখটাই দেখা যাচ্ছিল।

এই ব্যাপারের পর হফ্‌ম্যান্‌ এবং ঐ ছেলেটির খুবই কৌতূহল হল। ছেলেটি তখন প্যাকেট খুলে তার বাবার সার্ট বের করে

দেখে যে, একটা লাল কাপড়ে মোড়া বেশ কিছু টাকা সার্টের বুকের কাছে সেলাই করা রয়েছে।[১]

পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগই এই ঘটনার একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা।

এবার আর একটা ঘটনা শোনো, এটা খুবই ইণ্টারেস্টিং। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে রিলিজিয়ো ফিলসফিক্যাল জার্ণালে প্রথম বের হয় এবং পরে 'দি ওয়াট্সেকা ওয়াণ্ডার' এই নাম দিয়ে প্যাম্‌ফ্লেটের আকারে প্রকাশিত হয়। এটা লিখেছিলেন ডাক্তার ষ্টিভেন্স্। ফ্রেড্রিক-মায়ার্স, তাঁর লেখা 'হিউম্যান পার্সন্যালিটি অ্যান্ড্ ইট্স্ সারভাইভ্যাল অভ্ বডিলি ডেথ্'-এও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

মেরী লুর্যান্সি ভেনামের জন্ম হয় ইলিনয়ের ওয়াট্সেকা শহরে। মেরীর জন্মের পর ভেনাম পরিবার অন্যত্র চলে যান এবং মেরীর যখন সাত বছর বয়স তখন তাঁরা আবার ওয়াট্সেকায় ফিরে আসেন। তেরো বছর বয়সে মেরীর ফিটের ব্যারাম শুরু হয়। মাঝে মাঝে ফিটের পর তার একটা ভাবাবিষ্টের মত অবস্থা হ'ত। তখন সে স্বর্গে গিয়ে ছোট ভাই বোন ও অন্যেরা যারা মারা গেছে তাদের এবং দেবদূতদের দেখতে পাচ্ছে এই সব কথা বলত। অনেকেই মনে করলেন যে মেরীর মাথা খারাপ হয়েছে এবং তাকে পাগলা-গারদে ভর্তি করবার পরামর্শ দিলেন।

ক্রমে এই খবরটা এ. বি. রফ্ বলে এক ভদ্রলোকের কানে যায়। তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে থাকতেন ওয়াট্সেকা শহরের আর এক প্রান্তে। মেরী ভেনামের যখন সাত বছর বয়স ছিল তখন ভেনাম পরিবার রফ্দের বাড়ীর প্রায় এক ফার্লং দূরে একটা বাড়ীতে কয়েক মাস ছিলেন। সেই সময় মিঃ রফ্ ও মিঃ ভেনামের

১) The HeraldDubuque, Iowa, 11th February 1891.

মৌখিক পরিচয় হয়। মিসেস্ রফ্ একদিন অল্পক্ষণের জন্য মিসেস্ ভেনামের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিসেস্ ভেনাম কোনদিন রফ্দের বাড়ী যান নি। ভেনামরা ঐ বাড়ীতে আসবার প্রায় ছ' বছর আগে রফ্দের একটি মেয়ে মারা যায়। তারও নাম ছিল মেরী।

মিঃ ভেনামের মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে মিঃ রফ্ তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে উইস্কন্সিনের জ্যানেস্ভিল্ শহরের ডাক্তার ই. ডব্লিউ. স্টিভেন্স্কে দেখাবার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন যে তাঁর মেয়েরও ঐ রকম অসুখ হয়েছিল এবং ডাক্তার স্টিভেন্স্ তার চিকিৎসা করেছিলেন। মেয়েটি অবশ্য পরে মারা যায়, প্রায় উনিশ বছর বয়সে।

পরে মিঃ রফ্ ডাক্তার স্টিভেন্স্কে ভেনামদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। মেরী বিমর্ষ ভাবে একটা চেয়ারে বসেছিল, মেজাজ তার খিটখিটে। সে বাবাকে ডাকছিল বুড়ো ব্ল্যাক্-ভিক্ আর মাকে বুড়ি ঠাকুমা। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে সে ভালোভাবেই কথা বললো। নিজেকে সে প্রথমে বুড়ি ক্যাট্রিনা হোগান ও পরে উইলি ক্যানিং বলে পরিচয় দেয়। কিছুক্ষণ অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে সে ফিট্ হয়ে যায়। ডাক্তার তাকে হিপ্নটাইজ করে সুস্থ করে তোলেন। সে তখন বলে যে দুষ্ট আত্মারা তার ওপর কর্তৃত্ব করছিল। ডাক্তার স্টিভেন্স্ তাকে কোন ভাল আত্মার কর্তৃত্বাধীনে যাবার চেষ্টা করতে পরামর্শ দিলেন।

মেরী তখন মারা গেছে এমন কয়েকজন লোকের নাম করলো, তাদের মধ্যে মেরী রফের নামও ছিল।

মিঃ রফ্ তাঁর মেয়ের নাম শুনেই বলে উঠলেন, 'মেরী রফ্ আমারই মেয়ে। কিন্তু সে ত' বারো বছর হল মারা গেছে। তাকে আসতে দাও, সে এলে আমরা খুশী হবো। তোমাকেও সে সাহায্য করবে, সে খুব ভাল ও বুদ্ধিমতী ছিল।'

মেরী ভেনাম একটু চিন্তা করে ও আত্মাদের সঙ্গে পরামর্শ করে জানালো যে অন্য আত্মাদের বদলে মেরী রফ্‌ই আসবে।

মিঃ রফ্‌ তখন তাকে তার মার সঙ্গে তাঁদের বাড়ী যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা মিঃ ভেনাম মিঃ রফের সঙ্গে দেখা করে জানালেন যে তাঁর মেয়ে নিজেকে মেরী রফ্‌ বলে বলছে ও নিজের বাড়ী গিয়ে বাবা, মা ও ভাইদের দেখতে চাইছে।

এর দিন সাতেক পরে মিসেস্ রফ্‌ তাঁর মেয়ে মিসেস্ মিনার্ভা অলটারকে নিয়ে ভেনামদের বাড়ী গেলেন। জানালা দিয়ে দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে মেরী আনন্দে চীৎকার করে উঠল, 'ঐ যে মা আর নার্ভি আসছে।' মেরী রফ্‌ তার বোনকে নার্ভি বলে ডাকতো। তাঁরা এলে মেরী তাঁদের জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি।

এরপর সে বাড়ী যাবার জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ল। তার বাবা-মা তিন-চার দিন পর তাকে রফ্‌দের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

মেরী এর আগে কোনদিন রফ্‌দের বাড়ী যায়নি। মেরী-ভেনাম জন্মাবার সাড়ে সতেরো বছর আগে মেরী রফ্‌ জন্মেছিল। এবং মেরী ভেনামের যখন এক বছর তিন মাস বয়স তখন মেরী রফ্‌ মারা যায়।

রফদের বাড়ী এসে, বাবা-মা অর্থাৎ মিস্টার ও মিসেস্ রফ্‌ ও পরিবারবর্গের আর সবাইকে পেয়ে মেরী খুবই খুশী। সবাইকেই সে চিনতে পারলো। কতদিন থাকবে জিজ্ঞেস করায় সে বলে যে দেবদূতেরা তাকে মাস তিনেক থাকতে দেবে।

ঐ বাড়ীতে খুবই আনন্দে মেরীর দিন কাটে। সারাদিন সে বহু পুরানো পুরানো ঘটনার উল্লেখ করে, যা মেরী রফের জীবনে ঘটেছিল। রফ্‌দের যত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, মেরী রফ্‌ যাদের জানতো, তাদের সবাইকেই মেরী চিনতে পারে।

কিন্তু তার নিজের আত্মীয়স্বজন তাকে দেখতে এলে সে কাউকেই চিনতে পারে না, পরিচয় করিয়ে দিতে হয়।

একদিন রফ্‌দের পুরানো প্রতিবেশী এক ভদ্রমহিলাকে দেখে মেরী ভারি খুশী। 'মেরী রফ্‌ যখন মারা যায় তখন ওই ভদ্রমহিলা বিধবা ছিলেন, নাম ছিল মেরী লর্ড। কিন্তু মেরী রফ্‌ মারা যাবার পর তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন, মিঃ ওয়াগোনার বলে এক ভদ্রলোককে। মেরী তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'ও মেরী লর্ড, আপনাকে ঠিক আগের মতই দেখাচ্ছে। আমি ফিরে আসার পর যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের মধ্যে আপনারই সব চাইতে কম পরিবর্তন হয়েছে।'

আর একদিন মিসেস্ পার্কার বলে এক ভদ্রমহিলা তাঁর ছেলের বৌ নেলীকে নিয়ে রফ্‌দের বাড়ী এলেন। মেরী সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের পার্কার মাসীমা ও নেলী বলে কথা বলতে শুরু করে দিল। কথায় কথায় মেরী বলে, 'আচ্ছা মাসীমা, নার্ভি আর আমি যে আপনার বাড়ী গিয়ে গান গাইতাম তা আপনার মনে আছে?'

মিসেস পার্কারের মনে পড়ে গেল সে কথা। তাঁরা ও রফেরা তখন থাকতেন মিড্‌ল্ পোর্টে। মেরী রফ্‌ ও তার বোন সেই সময় তাঁদের বাড়ী গিয়ে 'মেরী হ্যাড্‌ এ লিট্‌ল্ ল্যাম্ব্‌' এই সব গান গাইত। এই ঘটনা ঘটেছিল মেরী ভেনামের জন্মের বারো বছর আগে।

মিঃ রফ্‌ একদিন সন্ধ্যার সময় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'আচ্ছা, মেরী মারা যাবার বছরখানেক আগে যে মাথায় একটা ভেলভেটের টুপি পরতো সেটা কি আছে? সেটা পেলে বাইরে বার করে রাখো ত', দেখি মিস্ ভেনাম চিনতে পারে কিনা?'

মিসেস্ রফ্‌ সেটা বের করে রেখে দিলেন। মেরী তখন বাইরে ছিল। একটু পরে বাড়ী এসে টুপিটা দেখতে পেয়েই সে বলে

উঠল, 'এইত' আমার টুপিটা, চুল যখন ছোট ছিল তখন পরতাম।'

একদিন ডাক্তার স্টিভেন্‌সের সঙ্গে মেরী তার আগের দিনের অর্থাৎ মেরী রফের গল্প করতে করতে বলে যে একবার সে তার হাত ভীষণভাবে কেটে ফেলেছিল। এই বলে সে হাতের কাটা দাগটা দেখাতে যায়। তারপরেই বলে, 'ওঃ, এই হাতে ত' নয়, সেটা মাটির তলায় আছে।' তারপর সে মারা যাবার পর তাকে কোথায় কি ভাবে কবর দেওয়া হয়, কে কে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, কে কি রকম দুঃখ করছিল সব বলে। সে আরও বলে যে মারা যাবার পর একবার সে একজন মিডিয়ামকে দিয়ে খট্‌ খট্‌ আওয়াজ করে একটা খবর পাঠিয়েছিল এবং আর একবার আর এক মিডিয়ামের মারফত একটা লেখা পাঠিয়েছিল। মিস্টার ও মিসেস্‌ রফ্‌ পরে জানালেন যে কথাগুলি সবই সত্যি।

রফ্‌দের বাড়ী থাকবাব সময় অন্য লোকে যা জানতোনা এরকম অনেক কথা মেরী বলে দিতে পারত। একদিন বিকেলে সে বললো যে তার ভাই ফ্রাঙ্ক্‌ অর্থাৎ মিঃ রফের ছেলে সেদিন রাত্রে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়বে। ফ্রাঙ্ক্‌ কিন্তু তখন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় ডাঃ স্টিভেন্‌স্‌ তাদের বাড়ী আসেন এবং চলে যাবার সময় জানান যে তিনি তখন পুরানো শহরে মিসেস্‌ হুকের বাড়ী যাবেন। রাত দুটোর সময় ফ্রাঙ্ক্‌ হঠাৎ করে সত্যি সত্যিই খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। মেরী তখন তাদেব প্রতিবেশী মিঃ মার্‌শের বাড়ী থেকে ডাঃ স্টিভেন্‌স্‌কে ডেকে আনতে বলে। বাড়ীর লোক বলে যে ডাঃ স্টিভেন্‌স্‌ ত' পুরানো শহরে। কিন্তু মেরী জোর দিয়ে বলে যে না তিনি মিঃ মার্‌শের বাড়ীতেই আছেন। ডাক্তারকে সেখানেই পাওয়া গেল।

এ বাড়ীতে আসবার তিন মাস দশ দিন পরে একদিন রাত দশটায় মেরী ঘুম থেকে উঠে মিস্টার ও মিসেস্‌ রফের ঘরে এসে

কাঁদতে কাঁদতে জানালো যে পরের দিন বেলা দশটায় সে মেরী ভেনামের শরীর ছেড়ে চলে যাবে। পরের দিন সে ঠিকই চলে গেল এবং মেরী ভেনাম ফিরে এলো তার নিজের শরীরে। তখন তাকে ভেনামদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বাড়ী এসে মেরী খুবই খুশী এবং সবাইকে চিনতেও পারলো। কিন্তু ডাঃ স্টিভেন্‌স্‌ যখন তাকে দেখতে এলেন মেরী তাঁকে চিনতেও পারলোনা। নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হল।[১]

ঘুমের মধ্যে, সম্মোহিত অবস্থায় এবং হিস্টিরিয়া রোগে মানুষের অস্বাভাবিক ব্যবহারগুলির থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই তিন অবস্থায় মানুষের এমন একটা—"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সুশান্ত বলে ওঠে, "ঘুম, সম্মোহিত অবস্থা এবং হিস্টিরিয়া কি একই জিনিস নাকি? কি বলছ তুমি?"

"এক জিনিস আমি বলছিনা। ঘুম শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম, সম্মোহিত অবস্থা একটা কৃত্রিম অবস্থা যা সাধারণতঃ ইচ্ছা করলেই ঘটানো যায় এবং ইচ্ছা করলেই কাটিয়ে দেওয়া যায় এবং হিস্টিরিয়াকে বলা হয় সাইকিয়্যাট্রিক ডিস্‌অর্ডার—এক ধরনের মানসিক বিকার। তবে এদের মধ্যে একদিকে মিল আছে। এই তিন অবস্থাতেই মানুষের স্বাভাবিক চেতনা তার কর্তৃত্বের জায়গা থেকে সরে যায়।

ঘুমন্ত এবং সম্মোহিত অবস্থায় বাইরের দিক থেকে সামান্য মিল দেখা গেলেও এই তিন অবস্থার স্বাভাবিক ব্যবহারগুলি ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু এই তিন অবস্থায় অস্বাভাবিক ব্যবহারের যে দৃষ্টান্তগুলি দিলাম তাদের মধ্যে একটা বিশেষ মিল আছে।

---

১) 'The Watseka Wonder'—E. W. Stevens, second Edition. Chicago Religio-Philosophical Publishing House.

সেটা হচ্ছে যে এই তিন অবস্থাতেই মানুষের আত্মা সময় সময় শরীর ছেড়ে বাইরে ঘুরে আসতে পারে এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া অন্যের মনের খবর জানতে পারে।

এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে মানুষের স্বাভাবিক চেতনা নিজের কর্তৃত্বের জায়গা থেকে সরে গেলে তার আত্মা সাময়িক ভাবে শরীর ছেড়ে ঘুরে আসতে পারে এবং সেই আত্মার সঙ্গে অন্য জীবিত কিম্বা মৃত ব্যক্তির আত্মার যোগাযোগ সম্ভব। এই যোগাযোগ দুই আত্মার মধ্যেও হতে পারে কিম্বা একটা ব্রেইন ও একটা আত্মার মধ্যেও হতে পারে। অর্থাৎ কারো স্বাভাবিক চেতনা নিজের কর্তৃত্বের জায়গা থেকে সরে গেলে তার ব্রেইনের সঙ্গে অন্য আত্মার যোগাযোগ হতে পারে।

হিস্টিরিয়া রোগের শেষ ঘটনা যেটা বললাম সেটায় দেখা যাচ্ছে যে মেরী ভেনামের আত্মা বেশ কিছু দিনের মত হয় তার শরীর ছেড়ে চলে গিয়েছিল নয় এমন একটা অবস্থায় ছিল যাতে মেরী রফের আত্মা তার শরীরের ওপর কর্তৃত্ব করতে পেরেছিল। আমরা এটাকে বলি ভর করা, ইংরেজীতে বলা হয় প্যজেশন।

কোন কোন লোক কিন্তু স্বাভাবিক সজ্ঞান অবস্থাতেই অন্যের মনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। স্বামী প্রণবানন্দ যেমন মুকুন্দকে দেখেই তার পরিচয় ও মনের কথা জেনে ফেলেছিলেন। মনে আছে ত' তোমার, স্বামী যোগানন্দের লেখা, 'অটোবাই-অগ্র্যাফি অভ্ এ যোগী'-র থেকে যে ঘটনাটা বলেছিলাম, স্বপ্নের কথা বলতে বলতে ?"

সুশান্ত মাথা নাড়ে।

আমি আবার বলতে শুরু করি, "সাধু মহাপুরুষদের জীবনীতে এ ধরনের ঘটনা বহু দেখতে পাবে। আমি নিজেও একটা অদ্ভুত থট্ রিডিং-এর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি। ব্যাপারটা ঘটেছিল

১৯৪৫ সালে। আমি তখন ময়মনসিং-এ ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনীয়ার।

একদিন সকালবেলা গেরুয়া রঙের জামা কাপড় পরা, মাথায় পাগড়ী বাঁধা, বিরাট চেহারা এক পাঞ্জাবী জ্যোতিষ, অফিসে আমার ঘরে এসে হাজির। বললেন, এক্‌জিকিউটিভ্‌ এঞ্জিনীয়ার, দত্ত সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন। বস্‌ পাঠিয়েছেন অতএব তাঁকে বসতে বলতে বাধ্য হলাম, এ ধরনের জ্যোতিষদের ওপর আমার কোন আস্থা ছিল না।

তিনি প্রথমেই বললেন 'আপনি একটি মেয়েকে ভালবাসেন।' তারপর আমার কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে পাগড়ীতে গোঁজা পেন্সিল বের করে কি যেন লিখলেন এবং কাগজটা ভাঁজ করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি যাকে ভালবাসেন যদি তার নাম লেখা দেখতে পান তাহলে বুঝবেন যে আমি আপনাকে যা যা বলবো তা সবই ফলবে।'

কাগজের ভাঁজ খুলে লেখা দেখে ত' আমি অবাক, ভাবী মিসেস্‌ ঘোষের নাম লেখা ইংরেজীতে বড় বড় অক্ষরে। তখন আমরা দুজন ছাড়া ব্যাপারটা কেউই জানতো না। অতএব এটা থট্‌ রিডিং ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা।

ইচ্ছে করে একজন যেমন আর একজনের মনের খবর জানতে পারে তেমনি ইচ্ছে করে একজন দূর থেকে আর একজনের মনে সংবাদ পাঠাতেও পারে। এর একটা অদ্ভুত ঘটনা শোনো। এটা আমি শ্রীঅজিত রায় বলে একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে শুনেছি, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। ভদ্রলোক আর্মিতে একজন মেজর ছিলেন, হালে রিটায়ার করেছেন।

১৯৪৫ সালে, জানুয়ারী মাসে, মেজর রায় একদিন রাত্রে কলকাতা থেকে যশোর যাচ্ছিলেন, একটা মিলিটারী ট্রাকে করে। তিনি নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন, ড্রাইভার পাশে বসেছিল। দমদম

পেরিয়ে যাবার পরই তিনি গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিলেন। সে সময় যশোর রোড রাস্তাটাও ভাল ছিল, ট্রাফিকও ছিল কম। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। মেজর রায় মনের সুখে অ্যাক্সিলারেটর চেপেছেন, গাড়ী চলেছে ষাট থেকে সত্তর মাইল স্পীড্-এ। মাঝে মাঝে গাড়ীতে ধাক্কা খেয়ে খরগোশ ছিট্কে পড়ছিল এদিকে ওদিক।

ঝিকুর গাছার কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ মেজর রায় শুনতে পেলেন কে যেন বলছে 'স্লো ডাউন' অর্থাৎ 'আস্তে যাও।' চমকে উঠলেন শ্রীরায়, প্রথমে ভাবলেন ড্রাইভার বলল নাকি কথাটা। তাকিয়ে দেখেন সে অঘোরে ঘুমাচ্ছে, তাছাড়া ড্রাইভার ইংরেজীতে এরকম আদেশের সুরে কথা বলতে সাহস পাবে না। তিনি অবাক হলেন খুবই, কিন্তু আগের মতই স্পীড্-এ চালাতে লাগলেন গাড়ী।

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার শুনতে পেলেন সেই একই কথা 'স্লো ডাউন', এবার আর একটু জোরে। ড্রাইভার তখনও ঘুমাচ্ছে। অ্যাক্সিলারেটর একটু ঢিলে দেন শ্রীরায়, ভাবেন কে এভাবে সতর্ক করছে তাঁকে। নিজেরই অবচেতন মনের সতর্কতার পরামর্শ কি তিনি শুনতে পাচ্ছেন এই ভাবে? ও কিছু নয় মনের ভুল, এই ভেবে আবার চাপেন অ্যাক্সিলারেটর। স্পীডোমিটারের কাঁটা সরে যায় আবার ষাট থেকে সত্তরের কোঠায়।

আর একটু যাবার পর তিনি আবার শোনেন 'স্লো ডাউন'। বেশ জোরেই কে যেন বলল কথাটা। এবার তিনি অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা উঠিয়ে নেন পুরোপুরি। গাড়ীর স্পীড্ কমতে কমতেও বেশ খানিকটা গিয়ে একটা বাঁক পার হয়ে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেইক চেপে ধরেন শ্রীরায়। সামনে ছিট্কে পড়ে আছে মানুষ, মোষ, একটা মোটর ও একটা মোষের গাড়ী। গাড়ী না থামালে তাঁরা গিয়ে পড়তেন তার ওপর।

কলকাতায় ফিরে এই ঘটনার দিন সাতেক পরে মেজর রায় একদিন এক তন্ত্র সাধকের বাড়ী গেলেন, যিনি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

মেজর রায়কে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'যাক কথাটা শুনেছিলে তাহলে।'

হঠাৎ একথার মানে বুঝতে না পেরে শ্রীরায় জিজ্ঞেস করেন, 'কি কথা কাকাবাবু?'

'রাস্তায় কি সেদিন তোমার কোন বিপদ হয়েছিল?'

সেদিন কি কি ঘটেছিল তার বর্ণনা দিয়ে শ্রীরায় জিজ্ঞেস করেন যে কে তাকে সেদিন বার বার 'স্লো ডাউন', 'স্লো ডাউন' বলে সাবধান করে দিয়েছিল?

মুচকি হেসে তন্ত্র সাধক বলেন, 'তা যেই বলুক।'

ইমান্যুয়েল সুইডেনবর্গের নাম হয়ত শুনেছো। তিনি ছিলেন মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, সুইডেনের স্টকহল্‌মে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মত পণ্ডিত লোক সুইডেনে খুব কমই জন্মেছেন। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকেরা যে সমস্ত পরমাণবিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার প্রায় দুশ' বছর আগে তিনি যুক্তি তর্কের দ্বারা একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র সব কিছুতেই তিনি তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। শারীরবিদ্যার ব্যাপারেও তিনি কিছু মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। পরে তিনি থিওলজি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা শুরু করেন এবং এ সম্পর্কে অনেক বইও লেখেন। এ বিষয়েও তাঁর বৈজ্ঞানিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী ও সূক্ষ্ম বিচার প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'স্বর্গ ও নরক' বইটি খুবই পরিচিত। সুইডেনবর্গ বলতেন যে তাঁর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছিল এবং তিনি সজ্ঞানে স্পিরিট ওঅ্যার্‌ল্‌ড্‌ অর্থাৎ আত্মিক বা ভৌতিক জগতে বিচরণ করতে পারতেন।

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক, ইমান্যুয়েল কাণ্টের ১৭৬৬ সালে লেখা 'ড্রীম্‌স্ অভ্ এ স্পিরিট সীয়ার' বইটা সুইডেনবর্গের আত্মিক বা ভৌতিক জগত সম্পর্কে ধারণার এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় নিয়েই লেখা। এই বই থেকে দুটো ঘটনা বলছি।

স্টকহল্‌মে ডাচ্ অ্যাম্‌বাস্যাডার্ মারা যাবার কিছু দিন পরে এক সেকরা তাঁর বিধবা স্ত্রীর কাছে এসে বলে যে তাঁর স্বামী যে রূপার বাসন-কোসন কিনেছিলেন সেগুলোর দাম পাওনা আছে। ভদ্রমহিলা ত' অবাক। তাঁর স্বামী এরকম পাওনা বাকি রাখবেন তা তাঁর বিশ্বাস হল না, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তিনি রসিদটা কোথাও পেলেন না। অনেক টাকার ব্যাপার তাই ভদ্রমহিলা নিরুপায় হয়ে সুইডেনবর্গকে তাঁর স্বামীর আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টা জেনে নেবার জন্য অনুরোধ করলেন।

কয়েক দিন পরে সুইডেনবর্গ, ডাচ্ অ্যাম্‌বাস্যাডারের স্ত্রীর বাড়ী এসে বললেন যে তিনি তাঁর স্বামীর আত্মার সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস আগেই তিনি ঐ দেনা চুকিয়ে দিয়েছেন এবং রসিদটা ওপর তলায় একটা রাইটিং টেবিলের ড্রয়ারে আছে।

ভদ্রমহিলা তখন বললেন যে ওসব তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছেন, ওখানে কোন রসিদ নেই।

সুইডেনবর্গ জবাব দিলেন যে তাঁর স্বামীর আত্মা বলেছেন যে ঐ টেবিলের বাঁ দিকের ড্রয়ারটা খুলে ফেললে একটা তক্তা দেখা যাবে এবং তক্তাটা সরিয়ে ফেললে একটা গুপ্ত খোপ বেরিয়ে পড়বে। এই খোপের মধ্যে তাঁর গোপনীয় চিঠিপত্র ও রসিদটা আছে।

ভদ্রমহিলার ঘরে আরও কয়েকজন লোক ছিলেন। সবাই মিলে তখন ওপরে গেলেন। লিখবার টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে

বের করে তার পেছনের তক্তাটা সরিয়ে ফেলার পর একটা গুপ্ত খোপ দেখা গেল এবং সুইডেনবর্গের কথা মত সেখানে চিঠি পত্রের মধ্যে রসিদটা পাওয়া গেল।

এই গুপ্ত খোপের কথা কারও জানা ছিল না।[১]

এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতে লিখেছে যে পরলোকগত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন বলে অনেকে সুইডেনবর্গকে মিডিয়াম মনে করতেন, কিন্তু তাঁর ব্যাপারটা মিডিয়ামের থেকে ভিন্ন। মিডিয়ামের বেলায় পরলোকের আত্মারা তার শরীরকে আশ্রয় করে ইহলোকে আসে কিন্তু সুইডেনবর্গ নিজেই পরলোকে বা আত্মিক জগতে প্রবেশ করতে পারতেন।[২]

১৭৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, একদিন বিকেল বেলা, গটেনবুর্গে এসে সুইডেনবর্গ তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী যান। কিছুক্ষণ পরে তিনি একবার বেরিয়ে যান এবং ফিরে এসে বলেন যে স্টকহল্মে ভীষণ আগুন লেগেছে। তাঁকে খুবই বিচলিত দেখা যায় এবং তিনি ঘন ঘন বাইরে যান। একবার বাইরে থেকে ঘুরে এসে তিনি বলেন যে আগুন খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁর নিজের বাড়ীতেও আগুন লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বলে তিনি জানালেন। সন্ধ্যার পর আবার একবার বাইরে থেকে ঘুরে এসে তিনি বললেন যে তাঁর বাড়ী থেকে তিনটা বাড়ী দূরে আগুন নিবিয়ে ফেলা হয়েছে।

সুইডেনবর্গের এই কথা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেই রাত্রেই কথাটা গভর্নারেরও কানে গেল। পরের দিন সকাল বেলা গভর্নার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে স্টকহল্মে আগুন লাগার বিষয় জানতে চাইলেন। সুইডেনবর্গ কখন কোথায় কি করে আগুন লাগে,

কি করে ছড়ায়, কতক্ষণ থাকে এবং কি ভাবে নেভানো হয় তার বিশদ বর্ণনা দেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় বার্তাবহ আগুন লাগার সংবাদ নিয়ে আসার পর দেখা গেল যে সুইডেনবর্গ যা যা বলেছিলেন তা পুরোপুরি সত্যি।[১]

এবার স্পিরিচুয়ালিষ্ট্দের বৈঠকের কথা বলি। এই বৈঠককে ইংরেজীতে সীয়ান্স বলা হয় এবং যারা এতে যোগদান করেন তাদের বলা হয় সিটার। সীয়ান্স সাধারণতঃ অল্প আলোতে হয় এবং সিটাররা হাত ধরাধরি করে বসেন। তবে এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, এবং কোন কোন মিডিয়ামের বেশী আলোতেও অসুবিধা হয় না।

ধীরে ধীরে মিডিয়াম অজ্ঞানের মত হয়ে যান, যে অবস্থাকে বলা হয়, এ স্টেইট অভ্ ট্রান্স্, অর্থাৎ আবিষ্ট অবস্থা। এই সময় তাঁর স্বাভাবিক চেতনা, নিজের কর্তৃত্বের জায়গা থেকে সরে যায় এবং সেখানে বিরাজ করে তাঁর অবচেতন মনের একটা স্তর। তখন মিডিয়াম সিটারদের মনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই বলতে পারেন। এ ব্যাপারে অশরীরী আত্মা বা মনের অস্তিত্ব মানবার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু কোন কোন সময় মিডিয়ামের কথা এবং কথা বলার ধরন-ধারন থেকে, সিটারদের মধ্যে কেউ না কেউ পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে তার কোন পরলোকগত আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু বান্ধব মিডিয়ামের মুখ দিয়ে কথা বলছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে আবিষ্ট অবস্থায় সময় সময় মিডিয়ামের আত্মা হয় তার শরীর ছেড়ে চলে যায় নয় এমন ভাবে থাকে যাতে কোন অশরীরী আত্মা তার শরীরে প্রবেশ করে তার ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে বা ভর করতে পারে।

১) 'Dreams of a Spirit-Seer'—Emanuel Kant, 1766.

এই ভর করা সম্পর্কে ফ্রেড্রিক মায়ার্স তাঁর 'হিউম্যান পার্সন্যালিটি অ্যান্ড্ ইট্স্ সারভাইভ্যাল অভ্ বডিলি ডেথ্' বইতে যা লিখেছেন তার থেকে একটু বলি, তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে তোমার সুবিধে হবে।

এখানে মিঃ মায়ার্স, মিডিয়ামের জায়গায় অটমেটিষ্ট শব্দটা ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ ইচ্ছা অনিচ্ছা ছাড়া কাজ করে এমন লোক।

'......the automatist, in the first place, falls into a trance, during which his spirit partially "quits his body" : enters at any rate into a state in which the spiritual world is more or less open to its perception ; and in which also—and this is the novelty—it so far ceases to occupy the organism as to leave room for an invading spirit to use it in somewhat the same fashion as its owner is accustomed to use it.

'The brain being thus left temporarily and partially uncontrolled, a disembodied spirit sometimes, but not always, succeeds in occupying it ; and occupies it with varying degrees of control. In some cases (Mrs Piper) two or more spirits may simultaneously control different portions of the same organism.

'The controlling spirit proves his identity mainly by reproducing, in speech or writing, facts which belong to his memory and not to the automatist's memory. He may also give

evidence of supernormal perception of other kinds.'[১]

(অটমেটিষ্ট্ প্রথমে আবিষ্ট হয়ে পড়ে, যখন তার আত্মা আংশিক-ভাবে শরীর ছেড়ে চলে যায় : যে করেই হোক সে এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয় যখন সে আত্মিক জগৎ প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং যে অবস্থায়—এবং এটাই হচ্ছে অভিনব—শরীরের ওপর তার আধিপত্য এমনভাবে ছেড়ে যায় যাতে একটা হানাদারী আত্মা তার শরীরটাকে, সে যেভাবে অভ্যস্ত অনেকটা সেই ভাবে ব্যবহার করতে পারে।

সেই সময় ব্রেইন্ সাময়িক ও আংশিক ভাবে অনিয়ন্ত্রিত থাকার জন্য কোন অশরীরী আত্মা, সময় সময়, কিন্তু সব সময় নয়, সেটা দখল করতে সক্ষম হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করে দখল করে। কোন কোন ক্ষেত্রে (মিসেস্ পাইপার) দুটো কিম্বা তার বেশী আত্মা একই অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এই নিয়ন্ত্রণকারী আত্মা প্রধানতঃ তার নিজের, অটমেটিষ্টের নয়, স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত ঘটনার কথা বলে কিম্বা লিখে নিজের ব্যক্তিগত পরিচয় প্রমাণ করে। সে অন্য ধরনের অস্বাভাবিক প্রত্যক্ষেরও প্রমাণ দিতে পারে।)

মিডিয়ামের ওপর ভর করে সোজাসুজি কথা বলবার ক্ষমতা সব আত্মার থাকে না। এজন্য প্রায় প্রত্যেক মিডিয়ামেরই একজন না একজন সাহায্যকারী আত্মা থাকেন যিনি অন্য আত্মাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে মিডিয়ামের ওপর ভর করে সেটা জানান। এই সাহায্যকারী আত্মাকে বলা হয় স্পিরিট্ কনট্রোল বা প্রেতাত্মা

১) 'Human Personality and its Survival of Bodily Death'—Frederic W. H. Myers. Vol. II, Page 190. Longmans, Green & Co. 1954.

পরিচালক। স্পিরিট্ কনট্রোল অন্য আত্মা ও সিটারদের মধ্যে ইণ্টারপ্রেটার অর্থাৎ দোভাষীর কাজ করেন। কোন কোন মিডিয়ামের আবার দু-তিন জন প্রেতাত্মা পরিচালকও থাকে। এ ক্ষেত্রে কথা বলবার ধরন-ধারন থেকে বিশিষ্ট কোন পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা যে সেটা বলছেন তা যাচাই করবার উপায় থাকেনা, কি কথা বলছেন তার থেকেই সেটা যাচাই করতে হয়। মিডিয়াম যে এই ভাবে কথা বলেন, তাকে বলা হয় অটমেটিক স্পীচ্।

কোন কোন সময় মিডিয়াম কথা না বলে লেখেন। এই লেখাকে বলা হয় অটমেটিক রাইটিং কেননা মিডিয়ামের কনশ্যাস্ এফর্ট অর্থাৎ সজ্ঞান চেষ্টা ছাড়াই এই লেখা হয়। সাধারণতঃ এই লেখার জন্য প্ল্যানশেট্ অথবা আউইজা বোর্ড ব্যবহার করা হয়।

প্ল্যানশেট্ হচ্ছে একটা ছোট তক্তা, যার তলায় সব দিকে ঘুরতে পারে এমন দুটো ছোট চাকা, এবং ওপরে একটা পেন্সিল এমনভাবে লাগানো থাকে যে তক্তার ওপর কাগজ রেখে তক্তাটা এদিক ওদিক নাড়ালে কাগজে দাগ পড়ে। মিডিয়াম আলগা করে তক্তায় হাত রাখলে তক্তাটা নড়ে নড়ে লেখা পড়ে।

আউইজা বোর্ডে তক্তার মাঝখানে সহজেই ঘুরতে পারে এমন একটা কাঁটা লাগানো থাকে, আর বাইরের দিকে গোল করে লেখা থাকে সব অক্ষরগুলো। মিডিয়াম কাঁটার ওপর আলগা করে আঙুল রাখলে কাঁটাটা ঘুরে ঘুরে এক একটা অক্ষর দেখায় এবং অন্যেরা সেগুলো লিখে ফেলে।

অনেক সময় প্ল্যানশেট্ বা আউইজা বোর্ডের দরকার হয় না। মিডিয়াম কাগজের ওপর আলগা করে পেন কিম্বা পেন্সিল ধরে রাখলে আপনা থেকেই লেখা পড়ে। কোন কোন সময় এই লেখা পরলোকগত ব্যক্তির জীবিত অবস্থার হাতের লেখার সঙ্গে মিলে যায়।

এই ভাবে কথা বলা ও লেখাকে বলা হয় ফেনোমেনা অভ্ মেন্টাল মিডিয়ামশিপ অর্থাৎ মিডিয়াম অবস্থার মানসিক ঘটনাবলী।

কোন কোন মিডিয়াম পরলোকগত জ্ঞানী ব্যক্তি বা ডাক্তারের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে অসুখ-বিসুখও সারাতে পারেন। এই মিডিয়ামদের আগে এক এক জাগায় এক এক নামে অভিহিত করা হত, যেমন উইচ্ ডক্টর, মেডিসিন ম্যান, শামান ইত্যাদি। এখনও বহু জায়গায় এই ধরনের লোক আছেন, এই কলকাতা শহরেই ক'জন পাবে। এই ভাবে অসুখ সারানোকে বলা হয় স্পিরিট্ হিলিং"

সুশান্ত বহুক্ষণ চুপ করে ছিল এইবার বলে উঠল, "দেখ ভাই উজ্জ্বল, এ সব হচ্ছে ফেইথ্ হিলিং অর্থাৎ মনের বিশ্বাসে অসুখ সারে। তুমি যে বলছিলে হিপ্‌নটাইজ করে অসুখ সারানো যায় এ-ও অনেকটা সেই রকম, যদিও এক্ষেত্রে ঠিক হিপ্‌নটাইজ করা হয়না। রোগীর মনে বিশ্বাস থাকলে স্বাভাবিক অবস্থাতেই সাজেশন দিয়ে কিছু কিছু অসুখ সারানো যায়।"

আমি বলি, "কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে এই ভাবে অসুখ সারে তা আমি অস্বীকার করিনা। ফেইথ্ হিলিং এর একটা মজার ঘটনা আমি বহুদিন আগে রাঁচিতে ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জির কাছে শুনেছিলাম। আমার ছোট মামা ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে এক সময় স্বদেশী আন্দোলন করতেন, সেই সূত্রেই একবার রাঁচিতে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তিনি তখন সেখানে প্র্যাক্‌টিস্ করতেন। একদিন এক আদিবাসী—ওরাও কি মুণ্ডা, কি যেন হবে, অসুস্থ হয়ে তাঁর কাছে আসে। তিনি তাকে প্রেসক্রিপশন্ করে দিয়ে কয়েকদিন পরে এসে কেমন থাকে না থাকে জানাতে বললেন। দিন কয়েক পরেই সেই রোগী এসে তাঁকে জানালো

যে তার অসুখ সেরে গেছে। সে কদিন কত ডোস্ ওষুধ খেয়েছে ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে ডাক্তার মুখার্জি জানতে পারলেন যে ওষুধ-টষুধ সে কিছুই খায়নি, তাঁর প্রেসক্রিপশন্ লেখা কাগজটাকেই ওষুধ মনে করে চিবিয়ে খেয়ে নিয়েছে এবং তাতেই তার অসুখ সেরে গেছে।"

সুশান্ত হো হো করে হেসে উঠে বলল, "তবেই দেখ।"

"একটা ঘটনার থেকে ত' আর সব ঘটনার বিচার করা চলে না। বারাসতে একজন বৈদ্য আছেন যাঁর কাছে দিনে প্রায় দেড়শ' দুশ' লোক যায়। তিনি তাঁর গুরুদেব, এক ফকীরের কবরের ওপর বসেন এবং গুরুদেবের আত্মা তাঁর ওপর ভর করার পর তিনি রোগ নির্ণয় করেন, কার রোগ সারবে না সারবে তা বলে দেন এবং ওষুধ দেন।

কন্সাল্টিং এঞ্জিনীয়ার, মিঃ পি. বোসের নাম নিশ্চয় শুনেছো। তিনি অনেকদিন ধরে সোরাইঅ্যাসিস্-এ ভুগছিলেন। অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি কোন কিছুতেই কোন উপকার হয়নি এবং সোরাইঅ্যাসিস্ ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে সারা গায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন একজনের কাছে ঐ বৈদ্যের কথা শুনে মিঃ বোস তাঁর কাছে যান এবং তাঁর ওষুধ খেয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মিঃ বোসের সোরাইঅ্যাসিস্ প্রায় সেরে যায়! 'একেবারে মির‍্যাক্ল্ এর মত' মিঃ বোস বলেন। মিঃ বোস আরও বলেন যে ঐ বৈদ্য অনেকের অনেক দুরারোগ্য রোগ সারিয়েছেন এবং এখনও সারাচ্ছেন।

এবার শোনো বিদেশের একটা ঘটনা—মিসেস্ পাইপার বলে এক সুবিখ্যাত মিডিয়ামকে পরীক্ষা করে স্যার্ অলিভার লজ সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তার থেকে। মিসেস্ পাইপারের ডাঃ ফিনুইট বলে একজন স্পিরিট্

কনট্রোল ছিল। সত্যিই এই নামে কোন লোক ছিল কিনা তা জানা যায়নি, তবে ছিলনা সেটা প্রমাণ করবারও কোন উপায় নেই। মিসেস্ পাইপার যখন আবিষ্ট হয়ে কথা বলতে শুরু করতেন তখন মনে হত না যে কোন স্ত্রীলোক কথা বলছেন, হাব-ভাব, গলার স্বর শুনে মনে হত পুরুষ মানুষ, একজন বৃদ্ধ লোক। এই সময় মিসেস্ পাইপার, কার কি রোগ হয়েছে এবং তার কি প্রতিকার, তা বলে দিতে পারতেন। তিনি যে সব কথা বলতেন ডাক্তারী শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে সে সব কারও পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। রোগীকে পরীক্ষা না করে এবং সময় সময় রোগীকে চোখে না দেখেই তিনি তার রোগ সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করেছেন।[১]

এই ব্যাপারটাও ফেনোমেনা অভ্ মেন্টাল মিডিয়ামশিপ অর্থাৎ মিডিয়াম অবস্থার মানসিক ঘটনাবলীর মধ্যেই পড়ল।

স্পিরিচুয়ালিষ্ট্দের বৈঠকে আরও নানা ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—যেমন দরজা জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘর ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঘরের মধ্যে রাখা বাজনা অথবা বাঁশী আপনা থেকেই বাজতে শুরু করে; মিডিয়াম শূন্যে ভেসে থাকে, যাকে বলা হয় লেভিটেশন; জিনিসপত্র নিজে নিজেই এদিক ওদিক যায় যাকে বলে টেলিকাইনেসিস্; ঘরে ছিলনা এমন জিনিস বাইরে থেকে ঘরে এসে পড়ে, যাকে বলা হয় অ্যাপোর্ট; সিটাররা অদৃশ্য হাতের স্পর্শ অনুভব করে ইত্যাদি। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে মেটিরিয়্যালাইজেশন ফেনোমেনা অর্থাৎ মানুষের মূর্তির আবির্ভাব। কোন কোন সময় মানুষের পুরো মূর্তি দেখা যায়, আবার কোন কোন সময় দেখা যায় শুধু হাত, পা বা মাথা। সাধারণতঃ মিডিয়ামের মুখ, নাক, কান থেকে একটা কুয়াশার মত

১) 'Society for Psychical Research Proceedings'—Vol. VI, Page 448-449.

জিনিস বের হতে দেখা যায় এবং সেই জিনিসটাই মানুষের আকার ধারণ করে। এই কুয়াশার মত জিনিসটাকে বলা হয় 'এক্টোপ্লাজম্'।

এ ধরনের সব ঘটনাগুলিকে বলা হয় ফেনোমেনা অভ্ ফিজিক্যাল মিডিয়ামশিপ অর্থাৎ মিডিয়াম অবস্থার বাস্তব ঘটনাবলী। প্রত্যেক সীয়ান্সেই যে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে এমন কোন কথা নেই বা প্রত্যেক মিডিয়ামকে ঘিরেই যে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে তারও কোন ঠিক নেই।

এবার মিডিয়াম অবস্থায় মানসিক ঘটনাবলীর কিছু উদাহরণ দিই।

অ্যামেরিকার প্রেসিডেণ্ট অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হলে মিডিয়ামের মারফৎ পরলোকগত আত্মার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। খুব সম্ভব ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারের আত্মা—যার ওপর লিঙ্কনের খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে গৃহ যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে তিনি কয়েকবার পরলোকগত আত্মার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদের আগেও তিনি পরলোকগত আত্মার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। মিসেস্ মেনার্ডের লেখা, 'ওয়াজ অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন এ স্পিরিচুয়ালিষ্ট্' বইয়ের থেকে একটা ঘটনা বলি। এটা মিসেস্ মেনার্ডের বিয়ের আগের ঘটনা, তখন তাঁর নাম ছিল নেটি কোলবার্ন।

একদিন সন্ধ্যায়, মিঃ সোম্স্ বলে এক ভদ্রলোক অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের নাম করে মিস্ কোলবার্নকে হোয়াইট হাউজে ডেকে নিয়ে গেলেন। মিঃ লিঙ্কন তাঁর অফিস ঘরে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি মিস্ কোলবার্নকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অথচ তাঁদের পরিচয় মিস্ কোলবার্নকে

দিলেন না। কিন্তু ভদ্রলোক দুজনের চাল-চলন হাবভাব দেখে মিস্ কোলবার্নের মনে হল যে তাঁরা সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারী। মিঃ লিঙ্কন তারপর মিসেস্ লিঙ্কনকে ডেকে পাঠালেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর মিস্ কোলবার্ন আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ঘণ্টাখানেক পরে জেগে উঠে তিনি দেখলেন যে টেবিলের ওপর একটা বড় মানচিত্রের সামনে হাতে একটা পেন্সিল নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। মিঃ লিঙ্কন ও সেনাবাহিনীর কর্মচারী দুজনও তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন, মিসেস্ লিঙ্কন ও মিঃ সোম্‌স্ বসেছিলেন দূরে, ঘরের কোণে।

মিঃ লিঙ্কন বললেন, 'আশ্চর্যের ব্যাপার, মিস্ কোলবার্ন যে কটা লাইন টেনেছেন তা সবই আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

বয়স্ক অফিসারটি বললেন, 'হ্যাঁ, এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।'

মিঃ লিঙ্কন আবার বললেন, 'কোন কিছু করতে মিস্ কোলবার্নের চোখের দরকার হয় না।'

মিস্ কোলবার্ন যখন আবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন তখন যে কি কি ঘটেছিল তা তাঁর কিছুই মনে ছিল না। তিনি পরে মিঃ সোম্‌সের কাছ থেকে শুনলেন যে আবিষ্ট অবস্থায় চোখ বন্ধ করে কারও কোন সাহায্য ছাড়াই তিনি মানচিত্রের কাছে গিয়েছিলেন এবং একটা পেন্সিল চেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ওপর যে প্রেতাত্মা ভর করেছিল তার প্রথম কথাতেই বোঝা যায় যে তাঁকে কেন আহ্বান করা হয়েছিল তা তিনি জানতেন। কিন্তু মিঃ সোম্‌স্ ও মিসেস্ লিঙ্কন পরে প্রেসিডেন্টের কথা মত দূরে গিয়ে বসায়, তাঁর ওপর ভর করা প্রেতাত্মা ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে যে আলোচনা হয় তা তিনি

শুনতে পাননি। এর থেকেই বোঝা যায় যে আলোচনাটা যুদ্ধের ব্যাপারে এবং গোপনীয়।"[১]

সুশান্ত বলল, "এটা ভাই থট্ রিডিং-এর ব্যাপার। মিস্ কোলবার্ন, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন ও আর্মির অফিসারদের মনের কথা জেনে নিয়ে ম্যাপে লাইন টেনেছিলেন। এ ব্যাপারে আত্মার অস্তিত্ব মানবার প্রশ্ন..."

আমি বাধা দিয়ে বলি, "কিন্তু মিস্ কোলবার্ন যে চোখ বুজে টেবিলের কাছে চলে এলেন এবং চোখ বুজে বুজে ম্যাপে দাগ কাটলেন।"

"ওটা এমন কিছু নয়। হয়ত তিনি পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে দেখছিলেন—কে জানে?"

আমি আর তর্ক করলামনা, বললাম, "আর একটা ঘটনা শোনো।

প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ স্যার্ অলিভার লজের ছেলে রেমণ্ড, প্রথম মহাযুদ্ধে মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। ১৯১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি যুদ্ধে মারা যান।

লেডি লজ ২৭শে সেপ্টেম্বরে নিজের পরিচয় গোপন করে একটা সীয়ান্সে যোগ দেন। সেখানে মিডিয়াম, রেমণ্ডের একটা গ্রুপ ফটোর কথা বলেন, যেটায় তাঁর হাতে একটা বেড়াবার ছড়ি আছে। মিডিয়াম আরও বলেন যে রেমণ্ড এই কথাটা বিশেষ করে জানাতে বলেছেন। লেডি লজ কিন্তু রেমণ্ড সম্পর্কে কোন কথাই বলেন নি, মিডিয়াম নিজের থেকেই তাঁর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন।

---

১) 'Was Abraham Lincoln a Spiritualist?'—Mrs. Maynard. 1891.

'True Experiences in Communicating with the Dead'—Seances with Abraham Lincoln—Nettie C. Maynard. Edited by Martin Ebon. (A Signet Mystic Book) The

এই ঘটনার প্রায় মাস দুই পরে লেডি লজ মিসেস্ চীভ্স্ বলে এক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। লজেরা মিসেস্ চীভ্স্কে চিনতেন না কিন্তু তাঁর ছেলে ক্যাপটেন চীভ্স্-এর সঙ্গে রেমণ্ডের পরিচয় ছিল; মিসেস্ চীভ্স্ সেনাবাহিনীর অফিসারদের একটা গ্রুপ ফটোর কথা লিখেছেন, যার মধ্যে তাঁর ছেলে ও রেমণ্ডের ফটো আছে এবং জানতে চেয়েছেন যে লেডি লজ তার কোন কপি চান কিনা?

লেডি লজ সঙ্গে সঙ্গে ঐ ফটোর একটা কপি চেয়ে মিসেস্ চীভ্স্কে চিঠি দিলেন।

ডিসেম্বরের তিন তারিখে, ফটোটা তখনও এসে পৌছয়নি; স্যার্ অলিভার আর একজন মিডিয়ামের কাছে গিয়ে রেমণ্ডের ফটো সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন। মিডিয়াম যা বললেন তা হচ্ছে মোটামুটি এই—ফটোতে অনেক কজন লোক আছে যাদের সবাইকে রেমণ্ড ভালমত চেনেন না, সবাই সেনাবাহিনীর লোক, রেমণ্ড বসেছিলেন ও তাঁর পেছনে কিছু লোক বসে ও কিছু লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন, লোকেরা ঘেঁষাঘেঁষি করে ছিল, একজন লোক রেমণ্ডের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল ইত্যাদি।

তারপর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রেমণ্ডের জিনিসপত্র এসে পৌছাল এবং সেগুলির মধ্যে তাঁর একটা ডায়েরী পাওয়া গেল। ডায়েরীতে লেখা ছিল যে ২৪শে আগস্ট ফটো তোলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি মারা যাবার একুশ দিন আগে। ফটোর প্রিন্ট পেতে নিশ্চয় দেরী হয়েছে। তিনি আদৌ ফটো দেখে যেতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাই তিনি বাবা মাকে ফটোর কথা জানাতে পারেননি।

সাত তারিখ ডিসেম্বরে মিসেস্ চীভ্স্-এর পাঠানো ফটো লজেরা পেলেন। মিডিয়াম দুজন যা যা বলেছিলেন দেখা গেল তা সবই সত্যি। তবে প্রথম মিডিয়াম যে বলেছিলেন রেমণ্ডের

হাতে একটা ছড়ি ছিল সেটা ঠিক নয়, ছড়ি ছিল ঠিকই, তবে সেটা হাতে ছিলনা পায়ের কাছে ছিল।”[১]

সুশান্ত বলল, “একটা ব্যাপার কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে, রেমণ্ড আর কোন সংবাদ পাঠালেন না বা সবাইকে ছেড়ে আসায় কষ্ট হচ্ছে সে সব কিছু বললেন না শুধু ফটোর কথাই জানালেন।”

“এর কারণ হল, আমার যতদূর মনে হয়, মারা যাবার পরেও যে তাঁর অস্তিত্ব আছে প্রথমে রেমণ্ড এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, বাবা মার জন্য কষ্ট হচ্ছে, এ ধরনের কথা ত' মিডিয়ামরা বানিয়ে বানিয়েও বলতে পারেন তাতে ত' তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারটা প্রমাণ হয় না। তাই তিনি এমন খবর পাঠালেন যাতে বোঝা যায় যে খবরটা তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। রেমণ্ড পরে আরও অনেক কথাই বলেছেন যেমন তাঁর বাবার বন্ধু, ফ্রেড্রিক মায়ার্স তার নতুন জীবনে অনেক সাহায্য করেছেন ইত্যাদি।

রেমণ্ড মারা যাবার পর এই সব ঘটনা ঘটবার আগেই স্যার্ অলিভার, শরীরের মৃত্যুর পরেও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। 'দি সারভাইভ্যাল অভ্ ম্যান'-এ তিনি লিখেছেন 'The old series of sittings with Mrs. Piper convinced me of survival for reasons which I should find it hard to formulate in any strict fashion, but that was their distinct effect.'[২]

(মিসেস্ পাইপারের সঙ্গে পুরানো ধারাবাহিক বৈঠকগুলির থেকে আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে মানুষ মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে।

১) 'Raymond or Life and Death'—Sir Oliver Lodge. Methuen & Co., Publisher. 1916. Page 105-109.

২) 'The Survival of Man'—Sir Oliver Lodge. Methuen & Co., Publisher. 190?. Page 321-322.

যদিও এই সিদ্ধান্তের কারণগুলি নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা আমার পক্ষে শক্ত তবে এটাই হল বৈঠকগুলির সুস্পষ্ট ফল।)

তিনি আরও লিখেছেন, 'The hypothesis of surviving intelligence and personality,—not only surviving but anxious and able with difficulty to communicate —is the simplest and most straight forward and the only one that fits all the facts.'[১]

(মৃত্যুর পরেও বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকে—শুধু যে বিদ্যমানই থাকে তা নয়, তারা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উৎসুক এবং কষ্টসাধ্য হলেও সক্ষম। এই সত্যই হচ্ছে সব চাইতে সহজ, সুস্পষ্ট এবং একমাত্র সত্য যা প্রকৃত ঘটনাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।)

স্যার্ উইলিঅ্যাম ব্যারেট্, এফ. আর. এস. এর লেখা 'অন্ দি থ্রেশহোল্ড্ অভ্ দি আনসীন'-এর থেকে একটা ঘটনা শোনো। ঘটনাটা ঘটেছিল ডাব্লিনে এবং এটার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'দি পার্ল টাইপিন কেস'।

মিস্ 'ক'-এর এক খুড়তুতো ভাই ফ্রান্সে যুদ্ধে মারা যান। তার মাস খানেক পরে মিস্ 'ক' একদিন ডাবলিনে এক সীয়ান্সে যোগ দেন। সেখানে আউইজা বোর্ডের কাঁটায় মিডিয়াম আঙুল রাখার পর কাঁটাটা ঘুরে ঘুরে মিস্ 'ক'-এর নাম বানান করে। মিস্ 'ক' তখন প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি জানেন আমি কে?'

আউইজার কাঁটা তখন ঘুরে ঘুরে মিস্ 'ক'-এর খুড়তুতো ভাইয়ের নাম বানান করে।

১) 'The Survival of Man'—Sir oliver Lodge. Methuen & Co., Publisher. 1909. Page 321-322.

তারপর আউইজাতে বানান করে, 'মাকে বোলো যে আমার মুক্তোর টাইপিনটা, আমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম তাকে যেন দিয়ে দেন। তারই এটা পাওয়া উচিত।'

তখন সেই মেয়েটির নাম ঠিকানা জানতে চাওয়া হলে আউইজাতে তার নাম ও ঠিকানা বানান করে। নামটা একটা অদ্ভুত নাম এবং কারও সেটা জানা ছিলনা।

পরে মেয়েটিকে চিঠি লেখা হয় কিন্তু চিঠি ফেরৎ আসে। মিস্ 'ক' তখন ভাবলেন যে খবরটা বাজে।

প্রায় ছয় মাস পরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মিস্ 'ক'-এর ভাইয়ের জিনিসপত্র এসে পৌঁছায়। সেগুলির মধ্যে তার একটা উইল পাওয়া যায়। উইলে ছেলেটি তার টাইপিনটা সেই মেয়েটিকে দিয়ে গেছে। আউইজাতে মেয়েটির যে নাম বানান করা হয়েছিল ঠিক সেই নাম। আরও জানা গেল যে ছেলেটি যুদ্ধে যাবার ঠিক আগে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ের এন্‌গেইজমেণ্ট করে ছিল। তার বাড়ীর কেউ কিন্তু এ খবর জানতোনা।

অতএব এই খবরটা মিস্ 'ক'-এর ভাই ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসা সম্ভব নয়।[১]

ডাক্তার রিচার্ড হজ্‌সনের সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে পাঠানো রিপোর্ট থেকে একটা ঘটনা শোনো।

জর্জ পেলহ্যাম বলে এক ভদ্রলোক,—এটা অবশ্য একটা ছদ্মনাম, ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, বত্রিশ বছর বয়সে দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি যদিও উকিল ছিলেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন এবং তাঁর লেখা দুটো বই খুব নাম করেছিল। অ্যামেরিকান সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ-এর সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সেই সূত্রে ডাক্তার রিচার্ড-

---

১) 'On the Threshold of the Unseen'—W. F. Barrett. 1917. Page 184-186.

হজ্‌সনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। মৃত্যুর পরেও যে মানুষ বেঁচে থাকে এই ধারণা তাঁর মতে শুধু অবিশ্বাস্যই নয় একেবারে ধারণার বাইরে। অবশ্য পরে ডাক্তার হজ্‌সনের সঙ্গে আলোচনায় মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার ব্যাপারটা, বিশ্বাস না করতে পারলেও ধারণা করা যায় এইটুকু তিনি মেনে নিয়েছিলেন। ডাক্তার হজ্‌সনের কাছে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে তিনি যদি ডাক্তার হজ্‌সনের আগে মারা যান এবং দেখেন যে তিনি বেঁচে আছেন, তাহলে সেকথা জানাবার জন্য তিনি আবহাওয়া সরগরম করে তুলবেন।

জর্জ পেলহ্যাম, সংক্ষেপে জি. পি. মারা যাবার চার পাঁচ সপ্তাহ পরেই একদিন তাঁর এক বিশেষ বন্ধু, জন হার্ট,—এটাও ছদ্মনাম, ডাক্তার হজ্‌সনের সঙ্গে বিখ্যাত মিডিয়াম মিসেস্‌ পাইপারের কাছে যান। মিসেস্‌ পাইপার, জন হার্ট বা জি. পি, কাউকেই চিনতেন না। সেই সীয়ান্সেই জি. পি.র আত্মার আবির্ভাব হয় এবং মিসেস্‌ পাইপারের প্রেতাত্মা পরিচালক, ফিনুইটের মাধ্যমে কথা বলেন। জি. পি. নিজের নাম, জন হার্টের নাম, দুজনের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুদের নাম করেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত কিছু কিছু ব্যাপারের কথা উল্লেখ করেন যা হার্টের জানা ছিল।

হার্টের হাতের বোতাম খুলে মিসেস্‌ পাইপারের হাতে দিলে ফিনুইট জি. পি. র হয়ে বললেন, 'এটা আমার বোতাম, আমি মারা যাবার পর তুমি পেয়েছো, মা ওগুলি আমার গায়ের থেকে খুলে নিয়েছিলেন আর বাবা তোমাকে দিয়েছিলেন।' বোতামগুলি জি. পি.র বাবা হার্টকে তাঁর ছেলের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রাখবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হার্ট পরে খোঁজ নিয়ে জানলেন যে জি. পি.র সৎমা, জি. পি.র গায়ের জামার থেকে ওগুলি খুলে নিয়েছিলেন।

এতে বোঝা যায় যে তাঁর মৃত্যুর পরের ঘটনার কথাও জি. পি. জানতেন।

সেই সীয়ান্সেই জি. পি. তাঁর সবচাইতে প্রিয় বন্ধু জেম্‌স্‌ হাওয়ার্ডের নাম করেন এবং বলেন, 'ক্যাথ্‌রিণকে বোলো আমি তার প্রশ্নের সমাধান করবো।'

হার্ট পরে হাওয়ার্ডের কাছে জানতে পারেন যে শেষবার যখন জি. পি. তাদের বাড়ী গিয়েছিলেন, তখন তার মেয়ে, ক্যাথ্‌রিণের সঙ্গে স্থান, কাল, ভগবান, অমরত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রায়ই তাদের আলোচনা হত। জি. পি. সেই সময় ক্যাথ্‌রিণকে বলেছিলেন যে সাধারণ স্বীকৃত সমাধানগুলি মোটেই সন্তোষজনক নয়, তিনি পরে এই প্রশ্নের সমাধান করে জানাবেন।

এই ঘটনার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে, জেম্‌স্‌ হাওয়ার্ড ও তাঁর স্ত্রী একদিন সীয়ান্সে আসেন। সেদিন জি. পি, সোজাসুজি মিসেস্‌ পাইপারের ওপর ভর করে কথা বলতে শুরু করেন। জি. পি. র কথাবার্তায় তাঁর বুদ্ধির ও আবেগের বৈশিষ্ট্য এত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়, এবং তিনি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের এত সব পুরানো কথা বলেন যে হাওয়ার্ড দম্পতির দৃঢ় ধারণা হল যে তাঁরা তাঁদের বন্ধুর সঙ্গেই কথা বলছিলেন, অথচ এর আগে কোন দিন তাঁরা পরলোক সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন না।

অন্য সব কথার মধ্যে জি. পি., সেদিন বলেছিলেন, 'জিম তুমিই কি? আমার সঙ্গে কথা বলো এখুনি। আমি মরিনি। ভেবোনা যে আমি মরে গেছি। তোমাদের দেখে খুবই খুশী হয়েছি। তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছোনা? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছোনা?……আমি এখানে সুখে আছি তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরে আরও সুখী। যাঁরা কথা বলতে পারেন না তাঁদের দেখলে মায়া হয়।…তোমরা জেনে রেখো যে আমি এখনও তোমাদের কথা ভাবি। জনকে কয়েকটা চিঠির কথা বলেছিলাম। আমি আমার জিনিসপত্র, বই, কাগজ সব আগোছালো ভাবে ফেলে এসেছি; তোমরা তার জন্য আমায় মাপ কোরো' ইত্যাদি।

তিনি এখন কোথায় আছেন কি করেন এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন 'এখনও আমার কিছু করবার মত ক্ষমতা হয়নি। মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্বের সত্যতা আমি সবেমাত্র উপলব্ধি করছি। আগে সবই যেন অন্ধকার ছিল কিছুই নির্ণয় করতে পারতামনা। একেবারে বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। শীগগীরই একটা কাজ হবে।··· তোমার কথা বলার ধরন ও গলার স্বর বুঝতে পারছি, তবে খানিকটা গুরুগম্ভীর ঢাকের আওয়াজের মত শোনাচ্ছে। আমার কথা তোমার কাছে মৃদু ফিস্ ফিস্ আওয়াজের মত মনে হবে।'···

একবার সীয়ান্সে জি. পি., তাঁর বাবা যে তাঁর ফটোর একটা কপি করতে দিয়েছেন, সেকথা জানান। পরে জানা গেল যে কথাটা ঠিকই, অথচ জি. পি র বাবা তাঁর মাকে পর্যন্ত একথা জানাননি।

মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে একথা জি. পি.র বাবা বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু লোকের মুখে জি. পি.র কথাবার্তা শুনে তিনি জি. পি.র সৎমাকে নিয়ে সীয়ান্সে আসেন। তখনও জি পি. তাঁদের পারিবারিক ব্যাপারের অনেক কথাই বলেন।

জি. পি. কে তাঁর নিজের অথবা তাঁর চেনা কোন জিনিস দেখালে সেগুলি সম্পর্কে যথাযথ মন্তব্য ত' করতেনই, এমন কি না দেখানো জিনিসেরও খবর করতেন। শুধু তাই নয় এই সব জিনিসকে ঘিরে নানা ঘটনার কথা বলে পুরাণো স্মৃতির পরিচয় দিতেন।

মিসেস্ পাইপারের কাছে যত সিটার যেতেন তাঁদের মধ্যে জি. পি. জীবিতকালে যাঁদের চিনতেন তাঁদের সবাইকেই সনাক্ত করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে পুরাণো দিনের কথা বলতেন। তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে যেরকম ভাব ছিল ঠিক সেই রকম ভাবেই তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন।

একদিন সীয়ান্সে তিনি ডাক্তার হজ্‌সনকে তাঁর নিজের অঙ্গীকারের কথা, অর্থাৎ মরার পরে বেঁচে থাকলে তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন সে কথাও মনে করিয়ে দেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে জি. পি. মিসেস্ মায়ার্সের ওপর ভর করে কথাবার্তা বলেছেন।[১]

এবার রাজকৃষ্ণ মিত্রের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে 'শোক বিজয়' বইয়ের থেকে একটা ঘটনা শোনো ; ঐ বইটা অবশ্য আমি পাইনি। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তি ভূষণের লেখা 'পরলোকের কথা'র থেকে বলছি। ঘটনাটা কবে হয়েছিল বলতে পারবোনা তবে ১৮৬৫ সালের পরে।

একদিন সীয়ান্সে মিডিয়ামের হাত দিয়ে লেখা বের হল, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মজুম—'

তখন সিটারদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনিই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিনা এবং এ-ও বললেন যে তিনি ত' মজুমদার ছিলেন না।

জবাব এলো যে তিনিই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং মজুমদার তাঁদের উপাধি। পরে জানা যায় যে কথাটা সত্যি এবং কবি ঐ ভাবেই নাম সই করতেন।

দু-চারটা কথাবার্তার পর তাঁকে কবিতা লিখতে অনুরোধ করা হল।

সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়ামের হাত দিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি তেরো লাইন কবিতা লেখা হল। তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে টিন বাঁধানো শ্লেটে ঘষা লেগে মিডিয়ামের হাত কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। এই দেখে সিটাররা চেপে ধরে মিডিয়ামের হাত থামিয়ে দিলেন এবং চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

---

১) 'Society for Psychical Research Proceedings'. Vol. XIII. Page 295-335.

পরে জানা যায় যে ঐ জায়গা থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে এক জায়গায় ঠিক একই সময়ে আর একটা সীয়ান্স বসেছিল এবং সেখানে এগারো লাইন কবিতা লেখা হয়। ঐ এগারো লাইন কবিতা আগের সীয়ান্সে লেখা কবিতাটির শেষের অংশ, অর্থাৎ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আত্মা আগের সীয়ান্সে বাধা পেয়ে পরের সীয়ান্সের মিডিয়ামের ওপর ভর করে কবিতাটি শেষ করেন। যাঁরা যাঁরা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা বলেছিলেন যে কবিতাটি তাঁর লেখা কবিতার মতই।[১]

চার্লস ডিকেন্সের 'দি মিষ্ট্রি অভ্ এডুইন ড্রুড' বইটাও একটা মিষ্ট্রি। এটাই ডিকেন্সের শেষ উপন্যাস, ধারাবাহিক ভাবে মাসে মাসে প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৮৭০ সালের ৮ই জুলাই লেখা শেষ না করেই ডিকেন্স মারা গেলেন এবং উপন্যাস অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

কিছুদিন পরে অ্যামেরিকার একজন মেকানিক, টি. পি. জেইম্স্-এর হাত দিয়ে অটমেটিক লেখায় ঐ উপন্যাস আবার লেখা শুরু হল, আগে যতদূর লেখা হয়েছিল তার পর থেকে। এই লেখার ধরন ঠিক আগের লেখার অর্থাৎ ডিকেন্সের লেখার মতই এবং আগে যতটা লেখা হয়েছিল তার থেকে এর পরিমাণ বেশী। ১৮৭৪ সালে, টি. পি. জেইম্স্ এই দুই অংশ একটা বইয়ের আকারে এক সঙ্গে প্রকাশ করেন—'দি মিষ্ট্রি অভ্ এডুইন ড্রুড, কমপ্লিট' এই নামে। লেখক চার্লস ডিকেন্স, ব্যাট্ল্বরো, ভারমণ্ট।

অটমেটিক লেখার একটা বিখ্যাত ঘটনা বলি। অনেক কটা বইতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, যেমন—জি, এন্, এম্ টাইরেলের লেখা, 'দি পার্সন্যালিটি অভ্ ম্যান্', অ্যালেন স্প্র্যাগেটের লেখা,

---

১) পরলোকের কথা—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তি ভূষণ—১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ, পত্রিকা হাউস, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৫৪।

'দি আন্‌এক্স্‌প্লেইন্‌ড্‌', ডাক্তার ওয়াল্টার্‌ ফ্র্যাঙ্কলিন্‌ প্রিন্সের লেখা, 'দি কেস্‌ অভ্‌ পেশেন্স ওয়ার্থ', এবং ক্যাসপার এস্‌ ইওস্টের লেখা 'পেশেন্স ওয়ার্থ : এ সাইকিক্‌ মিষ্ট্রি'।

মিসৌরির সেণ্ট লুই শহরের এক সাধারণ ভদ্রমহিলা, মিসেস্‌ জে. এইচ, কুর্‌র্যান মাঝে মাঝে আউইজা বোর্ডের কাঁটায় হাত রেখে বসতেন, কিন্তু লেখা বিশেষ কিছু বের হত না। ১৯১৩ সালের ৮ই জুলাই, হঠাৎ আউইজা বোর্ড বানান করতে শুরু করলো—'বহুদিন আগে আমি ছিলাম। আবার এলাম। আমার নাম পেশেন্স ওয়ার্থ' ইত্যাদি। এই দিনটি মিসেস্‌ কুর‍্যানের জীবনে একটা স্মরণীয় দিন কেননা ঐ দিন যে লেখা শুরু হল তা কয়েক বছর ধরে চললো এবং লেখার ধরন্‌ খুবই উঁচু স্তরের

অটমেটিক লেখাতেই পরে জানা গেল যে লেখিকা অশরীরী, তিনি ডরসেট্‌শায়ারে থাকতেন, পরে অ্যামেরিকায় এসেছিলেন, এবং রেড ইণ্ডিয়ানেরা তাঁকে খুন করে। তিনি নিজের সম্পর্কে বেশী বলতে চাইতেন না তাই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

নানা ধরনের লেখা বের হয়—গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রচনা ইত্যাদি, সব শুদ্ধ প্রায় তিরিশ লক্ষ শব্দ। উপন্যাস ও গল্পগুলির মধ্যে 'দি সরি টেইল', 'টেলকা', 'হোপ ট্রু ব্লাড্‌' এবং 'দি পট আপ-অন দি হুইল' সুপরিচিত।

পরে পেশেন্স ওয়ার্থ মিসেস্‌ কুর‍্যানের ওপর ভর করে কথাও বলতেন। তাঁর কয়েকটি কবিতা ব্রেথওয়েটের অ্যান্‌থলজি অভ্‌ ম্যাগার্জিন ভার্স-এ, যেখানে ভ্যাচেল লিণ্ডসে এবং এমি লোয়েলের মত প্রখ্যাতনামা অ্যামেরিকান কবিদের লেখা ছাপা হয়েছে, সেখানে স্থান পেয়েছে। তাঁর বেশ কয়েকটা বই প্রকাশিত হয় যার মধ্যে 'দি সরি টেইল' উপন্যাসটি হেনরি হোল্ট অ্যাণ্ড কোম্পানী ১৯১৭ সালে প্রকাশ করে।

বস্টন সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের রিসার্চ অফিসার, ডাঃ ওয়ালটার ফ্র্যাঙ্ক্‌লিন প্রিন্স, মিসেস্ কুর‍্যানের এই ব্যাপার ভালভাবে পরীক্ষা করেন এবং সোসাইটি তাঁর পরীক্ষার ফলাফল 'দি কেইস্ অভ্ পেশেন্স ওয়ার্থ' এই নামে প্রকাশ করে।

যীশু খ্রিস্টের জীবনী নিয়ে লেখা উপন্যাস, 'দি সরি টেইল' সম্পর্কে ডাক্তার ফ্রাঙ্ক্‌লিন প্রিন্স বলেছেন, 'I for one, own myself converted by this story from a mood of languid curiosity about one odd 'psychic' phenomena to a state of lively interest in the future published work of the powerful writer who, whether in or out of the flesh, goes by the name and speaks with the voice of 'Patience Worth'.[১]

(আমি, একজন, স্বীকার করি যে এই গল্প আমার পূর্বের আত্মাগত ব্যাপারে সামান্য কৌতূহলী মনোভাবকে এখন আকুল উৎসাহে পরিবর্তিত করেছে—এই শক্তিশালী লেখিকার ভবিষ্যৎ লেখার ব্যাপারে—যিনি শরীরীই হোন বা অশরীরীই হোন, পেশেন্স ওয়ার্থ নামে পরিচয় দিচ্ছেন এবং তার স্বরে কথা বলছেন)

সেণ্ট লুই গ্লোব ডিমোক্র্যাটের সম্পাদক, মিঃ ক্যাসপার এস্ ইওস্ট, 'দি সরি টেইল' সম্পর্কে বলেছেন যে লেখিকা রোম সাম্রাজ্যের সামাজিক জীবন, রীতিনীতি, বাণিজ্য, ক্রীতদাস প্রথা, শাসনতন্ত্র ইত্যাদি, রোমের প্রাদেশিক দেওয়ানদের অধীনে ইহুদীদের অবস্থা, তাদের আচার ব্যবহার, সামাজিক জীবন ইত্যাদি, প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক তথ্য, পবিত্র শহরের স্থাপত্য শিল্প এবং অন্যান্য জায়গা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

'টেল্কা'র ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এই গল্পের শতকরা নব্বই ভাগ শব্দ হচ্ছে অ্যাংলো স্যাক্সন্ এবং দশভাগ পুরানো ফ্রেঞ্চ।

---

১) 'The Case of Patience Worth'—Dr. Franklin Prince. Published by the Society for Psychical Research, Boston, 1917.

এই বইতে এমন কোন শব্দ ব্যবহার হয়নি যেটা সতেরো শতকের মাঝামাঝির পরে প্রচলিত হয়েছে। 'টেল্কা'য় মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

মিঃ ইওস্ট, 'দি সরি টেইল' সম্পর্কে আরও বলেছেন যে এই বই খুবই দ্রুতগতিতে লেখা হয়। যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করার ঘটনা, পাঁচ হাজার শব্দের একটা অধ্যায়, মাত্র এক সন্ধ্যায় লেখা হয়েছিল।'[১]

অতএব অশরীরী আত্মা মিডিয়ামের ওপর ভর করে শুধু যে অল্প সল্প কথা বলতে বা লিখতে পারে তা নয়, বিরাট বিরাট বইও লিখতে পারে।

এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা, স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্ সম্পর্কে আলোচনায় লিখেছে, 'In some seances, long book of history or fiction has been written.[২]' "

(কোন কোন সীয়ান্সে বিরাট বিরাট ইতিহাসের কিম্বা গল্পের বই লেখা হয়েছে)

সুশান্ত বলে, "পেশেন্স ওয়ার্থ নামটা হয়ত লেখিকার কল্পনা, আসলে বইগুলো তিনি নিজেই লিখেছেন; ভিক্টোরিয়া যুগের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, মেরী অ্যান্ ইভ্যান্স যেমন জর্জ এলিয়ট এই নামে বই লিখেছেন এবং এই নামেই পরিচিত। অনেকেই জর্জ এলিয়টের প্রকৃত নাম জানেন না।"

সুশান্তকে থামিয়ে দিয়ে বলি, "মিস্ ইভ্যান্সের নাম বদলাবার কারণ ছিল। তাঁর গোড়ার জীবনে কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং ১৮৫৪ সালে, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে তিনি জর্জ হেনরি লিউইস্ নামে একজন লেখকের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী হিসেবে বসবাস করেন। তাঁদের বিয়ে হয়নি, কেননা মিঃ লিউইসের স্ত্রী

---

১) 'Patience Worth : a Psychic Mystery'—Casper S. Yost, Editor. St Louis Globe Democrat.

জীবিত ছিলেন। তাঁর তিনটে গল্প 'দি স্যাড ফরচুন্স্ অভ্ দি রেভারেণ্ড অ্যামস্ বার্টন্', 'মিঃ গিল্‌ফিল্স্ লাভ স্টরি' এবং 'জ্যানেট্স্ রিপেন্ট্যান্স' যেগুলো আগে ধারাবাহিক ভাবে ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো ১৮৫৮ সালে এক সঙ্গে দুই ভল্যুম বইয়ের আকারে প্রকাশিত। সেই বইয়েই তিনি প্রথম জর্জ এলিয়ট এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। মিসেস কুর‍্যানের ছদ্মনামে লিখবার কোন কারণ ছিলনা, তাছাড়া তিনি ত' ঠিক ছদ্মনামে লেখেন নি, পেশেন্স ওয়ার্থের লেখা তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে একথাই তিনি বলতেন। তা ছাড়া মিসেস্ কুর‍্যানের মত একজন সাধারণ ভদ্রমহিলা যিনি ষোলো বছর বয়সে স্কুল ছেড়েছেন এবং কোনদিন বিদেশে যাননি তিনি হঠাৎ তিরিশ বছর বয়সে লেখা শুরু করে এরকম জ্ঞানের পরিচয় দেবেন তা কি করে সম্ভব হয়?"

সুশান্ত বলে, "অল্প বয়সে স্কুল ছাড়লেও বই পড়তে ত' আর আপত্তি নেই? তিনি নিশ্চয় স্কুল কলেজের বাইরে পড়াশোনা করেছেন, এবং তাঁর অবচেতন মনে প্রতিভা লুকানো ছিল যেটা বেশী বয়সে প্রকাশ পেয়েছে।"

আমি আবার বলি, "মিসেস্ কুর‍্যানের বাড়ীতে বিশেষ কোন বই ছিলনা এবং তাঁকে হামেশা লাইব্রেরীতে যেতেও দেখা যায় নি। তাছাড়া, কোন দেশ না দেখেই সেই দেশ সম্পর্কে এরকম সুস্পষ্ট ও জীবন্ত বর্ণনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। সে ক্ষেত্রে এরকম দ্রুত গতিতে কেউ লিখতেও পারেনা। অবচেতন মনের প্রতিভা, লেখায় মধ্যযুগীয় ভাষার ব্যবহারের ব্যাখ্যাও করতে পারেনা। তাহলে মানতে হয় যে মিসেস্ কুর‍্যানই পূর্ব জন্মে পেশেন্স ওয়ার্থ ছিলেন এবং সেই জন্মের স্মৃতি ও প্রতিভা তাঁর অবচেতন মনে ছিল। অবচেতন মন বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তার দ্বারা এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়না। এই লেখা মিসেস্ কুর‍্যানের অবচেতন মনের সৃষ্টি কিনা সেই প্রশ্নে

লণ্ডনের সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের প্রেসিডেন্ট, ডাঃ এফ.সি. এস. শিলার, 'দি কেইস অভ পেশেন্স ওয়ার্থ' বইয়ের সমালোচনায় লিখেছেন—'Personally, I am quite willing to subscribe to Dr. Prince's conclusion that either our concept of what we call the subconscious must be radically altered, so as to include potencies of which we hitherto have had no knowledge or else some cause operating through but not originating in the subconsciousness of Mrs. Curran must be acknowledged.'[১]

(ব্যক্তিগত ভাবে আমি ডাক্তার প্রিন্সের সিদ্ধান্তের সমর্থন করি, যা হচ্ছে, হয় আমরা যাকে অবচেতন মন বলি সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন করতে হবে, এবং এতদিন আমরা যেটা জানতামনা, সেরকম শক্তি এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, নয় এই ব্যাপারের এমন একটা নিমিত্ত মানতে হবে যা মিসেস্ কুর‍্যানের মনের মাধ্যমে কাজ করছে, কিন্তু সেখানে উৎপত্তি হচ্ছেনা।)

পেশেন্স ওয়ার্থ বলেছেন যে তাঁর লিখবার ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যই তিনি ফিরে এসেছেন এবং আমার মনে হয় সেটাই এই অদ্ভুত ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা।"

সুশান্ত আর কিছু বলেনা। আমি আবার শুরু করি, "কোন কোন মিডিয়াম তাঁর না জানা ভাষায় লিখতেও পারেন। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ এ বিষয়ে পরলোকের কথায় এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন, 'একদিন হেমন্তবাবুর হাত দিয়া উর্দ্দু লেখা বাহির হইল। তিনি কিংবা আমাদের পরিবারস্থ বা গ্রামস্থ কেহই উর্দ্দু লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। আমাদের

১) 'The Personality of Man'—G. N. M. Tyrell (Pelican Books) Penguin Books, publisher. 1948.

গ্রামের পাশে মিশ্রী দেয়াড়া গ্রামে মীর হবিবর ছোভাহান নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহার নিকট ঐ লেখা পাঠাইলে তিনি উহার পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন।'[১]

হেমন্ত বাবু ছিলেন শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের বাবা।

ব্র্যাজিলে মিরাবেলি নামে এক ভদ্রমহিলা, ১৮৮৯ সালে তাঁর জন্ম, আবিষ্ট অবস্থায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালেলিও, জ্যোতির্বিদ কেপ্‌লার এবং সাহিত্যিক ভলটেয়ারের ধরনে প্রবন্ধ লিখতে পারতেন। আবিষ্ট অবস্থায় তাঁর হাত দিয়ে নানা ভাষায় লেখাও বের হত—রুশ, হিব্রু, অ্যাফ্রিকান ইত্যাদি।[২]

অ্যামেরিকায় একজন লিবার‍্যাল সেনেটারের স্ত্রীর বাবা হঠাৎ মারা যান, তিনি মারা যাবার পর তাঁর উইল আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। ভদ্রমহিলা তখন ডেট্রয়েটের প্রখ্যাত মিডিয়াম, মিসেস্‌ এট্যা রীট্‌-এর কাছে যান এবং ভদ্রমহিলার বাবা মিসেস্‌ রীট্‌-এর ওপর ভর করে জানিয়ে দেন উইলটা কোথায় আছে। উইলটা ছিল ফ্রান্সের এক বাড়ীতে, একটা দেরাজওয়ালা আলমারির মধ্যে। এ খবর সেনেটারের স্ত্রীর বাবা ছাড়া আর কারও জানা ছিলনা।[৩]

এবার সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির প্রসিডিংস্‌ থেকে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলি। ঐ সোসাইটির কয়েকজন সদস্যের

মৃত্যুর পর তাঁদের অশরীরী আত্মা কয়েকজন মিডিয়ামের মারফত বার্তা পাঠাতে শুরু করেন। এই অশরীরী বার্তাপ্রেরকদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেড্‌রিক মায়ার্স যিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ওই সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন, হেনরি সিজ্‌উইক, যিনি ছিলেন ওই সোসাইটির প্রথম সভাপতি এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং এডমণ্ড গুরুণে, যিনি ছিলেন 'প্রথম অন্যারারি সেক্রেটারি এবং ১৮৮৮ সালে মারা গিয়েছিলেন। বেশীর ভাগ লেখাতেই এঁদের নাম সই থাকতো এবং লেখার ব্যাপারে মিঃ মায়ার্সের ভূমিকাই ছিল প্রধান।

যে সব ভদ্রমহিলা এই বার্তাগুলি অটমেটিকভাবে লিখতেন তাঁরা সকলে কিন্তু পেশাদার মিডিয়াম ছিলেন না এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ঐ লেখার সময় যথেষ্ট বাইরের জ্ঞান থাকত। তাঁরা সকলেই সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির কাজে উৎসাহী ছিলেন এবং যখন যা লিখতেন সবই পাঠিয়ে দিতেন ঐ সোসাইটির অফিসে; সেখানে গবেষকরা তাঁদের লেখাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতেন।

প্রথম দিকের বার্তাগুলির মধ্যে ফুটে উঠত এই সব পরলোকগত ব্যক্তির অর্থাৎ মিঃ মায়ার্স, মিঃ গুরুণে এবং মিঃ সিজ্‌উইকের জ্ঞান ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।

যে মিডিয়ামেরা এই সব বার্তা লিখতেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসেস্ হল্যাণ্ড। মিঃ মায়ার্স, মিঃ গুরুণে এবং অন্‌র্যাব্‌ল্ রডেন নোয়েল, মিসেস্ হল্যাণ্ডের মারফত যে সব বার্তা পাঠিয়েছেন, সেগুলি পরীক্ষা করে স্যার উইলিয়াম ব্যারেট, ফেলো অভ্ রয়াল্ সোসাইটি, মন্তব্য করেছেন, '...When they were on earth I knew these distinguished men personally, and was in frequent correspondence with each of them; hence from my own knowledge I can affirm that

these communications are singularly characteristic of the respective and divers temperament of each.'[১]

(তাঁরা যখন ইহলোকে ছিলেন তখন এই সব সম্মানিত ব্যক্তিদের আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম এবং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই হামেশা চিঠিপত্রের আদান প্রদান করতাম; অতএব আমার নিজস্ব জ্ঞান থেকে আমি হলফ্ করে বলতে পারি যে ঐ বার্তাগুলি অদ্ভুত ভাবে তাঁদের নিজ নিজ বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় দেয়।)

কিন্তু তা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেন না। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে এই সব বার্তা, মিডিয়ামদের চেতন ও অবচেতন মনের অনুমান প্রসূত।

এর কিছুদিন পরে ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ামের সমসাময়িক লেখা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সেগুলি একই বিষয় নিয়ে লেখা, যেমন—১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে, তিনজন মিডিয়াম মৃত্যু সম্পর্কে গ্রীক্, ল্যাটিন ও ইংরেজী ভাষায় কিছু কিছু লিখলেন। কথাটা একটু ভুল হল, দুজন লিখলেন একজন বললেন। এঁদের মধ্যে মিসেস্ পাইপার, স্পিরিট হিলিং সম্পর্কে যাঁর কথা তোমায় আগে বলেছি, আবিষ্ট অবস্থায় 'মৃত্যু' কথাটা গ্রীক ভাষায় বললেন। অথচ গ্রীক ভাষা তিনি জানতেন না, প্রথমে দু-একবার ভুল করে পরে ঠিকভাবে বলেন কথাটা। আর দুজন ভদ্রমহিলা, মিসেস্ হল্যাণ্ড ও মিসেস্ ভেরাল দুজনেই মৃত্যু সম্পর্কে কিছু কিছু লেখেন। মিসেস্ হল্যাণ্ড মৃত্যু কথাটা ল্যাটিন ভাষায় লেখেন, যদিও তিনি ল্যাটিন জানতেন না। এই তিনজন মিডিয়ামের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ ছিল না; মিসেস্ হল্যাণ্ড ছিলেন ভারতবর্ষে এবং বাকি দুজন ছিলেন বিলেতে।

---

১) 'On the Threshold of the Unseen'—W. F. Barrett. 1917. Page 201.—202

এই কজন এবং অন্যান্য মিডিয়ামেরা, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে এই ধরনের আরও অনেক কথা লেখেন। এর থেকে বোঝা যায় যে একটা মন, কিম্বা সঙ্ঘবদ্ধ একদল মন এই বার্তাগুলি পাঠাচ্ছিল।

কিন্তু সন্দেহবাদীদের এতেও মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হয় না।

তাঁরা কেউ কেউ বললেন যে এগুলি হচ্ছে, চান্স্ কোইন্সিডেন্স্ অর্থাৎ হঠাৎ মিলে যাওয়া ব্যাপার, এবং কেউ বললেন যে মিডিয়ামদের মধ্যে টেলিপ্যাথি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া মন জানাজানিই হচ্ছে এগুলির কারণ।

আরও পরে দেখা গেল যে এক একজন মিডিয়াম এক এক কথা লিখছেন যার আলাদা আলাদা বিশেষ কোন মানেই হয়না, কিন্তু সেগুলি এক সঙ্গে ঠিকভাবে মিলিয়ে সাজালে একটা সম্পূর্ণ কথা হয়। যেমন ধর, একটা ছবিকে কয়েক টুকরো করে কেটে ফেলে, এক একটা টুকরো আলাদা করে দেখলে, সেই ছবিটা যে কিসের তা বোঝা যায়না, টুকরোগুলি ঠিকমত মিলিয়ে সাজালেই ছবিটা বোঝা যায়। এই লেখাগুলিও ঠিক সেই রকম।

এই লেখাগুলি কোন্টার সঙ্গে কোন্টা মিলবে, এবং কিভাবে সেগুলি সাজাতে হবে, সেটা বোঝাও যথেষ্ট শক্ত ব্যাপার, সকলের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। গ্রীক ভাষা এবং প্রাচীন গ্রীক লেখকদের লেখা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকলেই সেটা বোঝা সম্ভব। মিঃ মায়ার্স ও মিঃ সিজ্উইকের এ বিষয়ে অগাধ জ্ঞান ছিল।

সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির গবেষকরা এই লেখাগুলির মানে উদ্ধার করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান এবং বহু পরিশ্রমের পর তাঁরা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। এই লেখাগুলির তাঁরা নাম দিলেন 'ক্রস্-করেস্পন্ডেন্স্'।

বহু বছর ধরে চলল এই ক্রস্-করেস্পন্ডেন্স্, এবং পরে হেনরি বুচার ও এ. ডাবলিউ. ভেরাল এই বার্তা প্রেরকদের দলে যোগ

দিলেন। এঁরা দুজনেও ছিলেন গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত। মিঃ বুচার মারা যান ১৯১০ সালে এবং মিঃ ভেরাল ১৯১২ সালে।

মিডিয়ামেরা বুঝতেনই না তাঁরা কি লিখছেন, এমনকি পণ্ডিত গবেষকেরাও বহু লেখার মানে বুঝতে পারেন নি।[১]

এই ধরনের লেখা এত জড়ো হয়েছিল, যে এগুলিকে হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মিডিয়ামদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া মন জানাজানি বলেও এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা চলে না, কেননা মিডিয়ামেরা নিজেরাই তাঁদের লেখার আসল মানে জানতেন না।

অতএব এই ক্রস-করেস্‌পনডেন্‌স্‌ মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করে—যার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই নেই।

এই ব্যাপারে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। সেটা হচ্ছে যে জীবিত অবস্থায় মিঃ মায়ার্সের ক্রস্‌-করেস্‌পন্‌ডেন্‌স্‌ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, থাকলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর লেখা বইগুলিতে এ বিষয়েও উল্লেখ করতেন। পরলোকে গিয়ে যখন তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা, নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য, বার্তা পাঠাতে শুরু করলেন তখনও তাঁর এ বিষয়ে কোন ধারণা ছিলনা, থাকলে প্রথমেই তিনি ক্রস্‌-করেস্‌পনডেন্‌স্‌ শুরু করে দিতেন। যখন তিনি দেখলেন যে তাঁদের পাঠানো বার্তাগুলিকে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হয়েছে, তখন তিনি সেই সব যুক্তিগুলিকে নির্মূলভাবে খণ্ডন করার জন্য এই অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন।

অতএব স্বর্গীয় মায়ার্স মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বই শুধু প্রমাণ

১। 'Society for Psychical Research Proceedings,'
'The Personality of Man'—G. N. M. Tyrrell. (Pelican Books) Penguin Books, publisher. 1948. Page 144-150.

করেন নি, তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে মৃত্যুর পর আত্মার চিন্তা করে নতুন জিনিস উদ্ভাবন করবার ক্ষমতাও থাকে।

মরার পর বেঁচে থাকার প্রশ্নে, 'সাইকিক্যাল রিসার্চ' এই হেডিং-এ, 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা' কি বলছে শোনো।

'Soon after Myer's death in 1901 an experimental demonstration of survival was arranged ostensibly from the other side of the grave, presumably by Myers himself. Called cross-correspondence, essentially it was communication, through different mediums, of fragments of a message that made a coherent whole only when fitted together. Success in such a task cannot easily be explained by reference to possible para-normal powers of the medium. Its results are not easy to evaluate, but many competent judges are of the opinion that the cross-correspondence provide strong evidence of the survival of the deceased persons who were their ostensible originators.' [১]"

(মায়ার্সের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই পরলোক থেকে, খুব সম্ভব মায়ার্সের দ্বারাই, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। ক্রস্-করেস্পন্ডেন্স্ নামে অভিহিত এই ব্যাপারটার সারমর্ম হচ্ছে—বিভিন্ন মিডিয়ামের মারফত ভাগ ভাগ করে একটা বার্তা প্রেরণ করা, যেগুলি যথাযথভাবে

জুড়লে পরেই একটা পরিপূর্ণ অর্থ হয়। মিডিয়ামদের অসাধারণ ক্ষমতার দোহাই দিয়ে সহজে এরকম একটা কাজে সাফল্যের ব্যাখ্যা করা চলে না। এর ফলাফলের মূল্য নির্ধারণ করা সহজ নয়, কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারকেরা এই মত পোষণ করেন যে, ক্রস্-করেস্পন্ডেন্স্, যাঁরা এটা উদ্ভাবন করেছেন সেই সব পরলোকগত ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার জোরালো প্রমাণ দেয়।)

সুশান্ত চুপ করে রইল, আমি আবার শুরু করি।

"ফেনোমেনা অভ্ মেন্টাল মিডিয়ামশিপ অর্থাৎ মিডিয়াম অবস্থার মানসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা মোটামুটি শেষ হল। ওঃ না শেষ ত' হয়নি একটা ব্যাপার বাকি রয়ে গেছে, 'ডিভাইনিং রড।'

শুনেছ বোধহয় যে এক ধরনের লোক আছে যারা মাটির তলায় জলের সন্ধান বলে দিতে পারে। যে সব জায়গায় জলের অভাব সে সব জায়গায় এই ধরনের সত্যিকারের ক্ষমতাওয়ালা লোকের ত' খুবই চাহিদা ছিল এক কালে। পৃথিবীর বহু দেশেই একদিন না একদিন এই ধরনের লোকদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, এখনও নেওয়া হয় কোথাও কোথাও। এদের ইংরেজীতে বলা হয় ডাওজার। কথাটার বাংলা আমার জানা নেই।

এদের এই কাজের জন্য দরকার হয় Y ওয়াই-এর মত একটা সরু গাছের ডাল, ছেলেরা যা দিয়ে গুলতি বানায় তার মত, তবে তার থেকে বড়। কোন কোন সময় লোহা বা অন্য কোন ধাতুর তার দিয়েও বানানো হয়। এ জিনিসটাকে বলা হয় ডিভাইনিং রড। এ কথাটারও বাংলা জানিনা। সাধারণত দেখা যায় যে গাছের ডালের ডিভাইনিং রড়-ই ভাল কাজ করে।

ডাওজার, ওয়াই-এর মাথা দুটো দুহাতে শক্ত করে চেপে ওয়াই-এর নীচের মুখটা সামনে বাড়িয়ে ধরে হাঁটতে থাকে। এই সময়

ডাওজারদের হিপ্‌নটিক ট্রান্‌স্‌ বা সম্মোহিত অবস্থার মত একটা অবস্থা হয়, কারও কম কারও বেশী। অন্য কেউ তাদের হিপ্‌নটাইজ করেনা তারা নিজে নিজেই এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করে। জলের কাছাকাছি গেলে ওয়াই-এর নীচের মুখটা ওপরে নীচে ওঠা নামা করতে থাকে একটা স্প্রিং-এর মত।

ডাওজার এভাবে হেঁটে হেঁটে মাটির তলার জল কোন দিক দিয়ে গেছে তা দেখিয়ে দিতে পারে। ওয়াই-এর শেষ মাথাটা কত জোরে নড়াচড়া করে তার থেকে জল মাটির কত নীচে আছে তা-ও ডাওজাররা মোটামুটিভাবে বলতে পারে।

অটমেটিক লেখার সময় যেমন মিডিয়ামের সজ্ঞান চেষ্টা ছাড়াই লেখা হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রেও তেমনি ডাওজারের সজ্ঞান চেষ্টা ছাড়াই কাঠির মুখটা ওঠা নামা করে। মিডিয়ামদের ক্ষেত্রে যেমন অনেক সময় মিডিয়াম টেবিলের ওপর আলগা করে হাত রাখলেও টেবিল খুব জোরে নড়াচড়া করতে থাকে ডাওজারদের বেলাতেও তেমনি কাঠিটা এক এক সময় এত জোরে নড়াচড়া করে যে সেটা ধরে রাখাই শক্ত। ডাওজারদের হাতে অনেক সময় কড়া পড়ে যেতে দেখা গেছে।

এ ভাবে যে শুধু জলের সন্ধানই পাওয়া যায় তা নয়, সোনা রূপা ইত্যাদি ধাতু, কয়লা, পাথর এমন কি মাটির নীচে বড় গর্ত বা টানেল থাকলে তারও সন্ধান পাওয়া যায়।

'দি সাইকিক্‌ ওঅ্যার্লড অ্যারাউণ্ড আস্‌'-এ লং জন নেবেল ও স্ট্যানফোর্ড টেলার লিখেছেন যে ভিয়েটনামের যুদ্ধে অ্যামেরিকান সৈন্যরা নাকি সময় সময় গুপ্ত টানেলের অনুসন্ধান করবার জন্য ডিভাইনিং রড ব্যবহার করেন। তবে সকলের হাতে এটা কাজ করেনা।[১]

এবার ফেনোমেনা অভ্ ফিজিকাল মিডিয়ামশিপ অর্থাৎ মিডিয়াম অবস্থার বাস্তব ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু বলি। সীয়ান্সে অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালিষ্ট্দের বৈঠকে, কি ধরনের ঘটনা ঘটে তার একটা মোটামুটি বর্ণনা আগে দিয়েছি এখন কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিই। তার আগে অবশ্য এ বিষয়ে দু-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

পেশাদার মিডিয়ামদের অনেক সময় চালাকি করে নানা রকম অদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি করতে দেখা গেছে। এর আসল কারণ হচ্ছে যে এসব ঘটনা ঘটবার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই; কোনদিন হয়ত বৈঠক শুরু হতে না হতেই ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে এবং বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে; কোনদিন হয়ত বৈঠক শুরু হবার দু-তিন ঘণ্টা পরে ঘটনা ঘটে, কোনদিন আবার হয়ত একটা ঘটনাও ঘটেনা। অথচ বৈঠকে যোগদানকারীরা, বিশেষ করে যাঁরা পয়সা দিয়ে ভৌতিক ক্রিয়া দেখতে এসেছেন, তাঁরা পরের পর চাঞ্চল্যকর ঘটনা দেখতে চান। তাই মিডিয়ামেরা বাধ্য হয়ে চালাকির আশ্রয় নেন। সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির তদন্তকারীরা এবং অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা অনেক সময় মিডিয়ামদের চালাকি হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন।

মিডিয়ামেরা যাতে জাল-জোচ্চুরি করতে না পারেন তার জন্য সিটাররা নানা রকম কড়াকড়ি বন্দোবস্ত করেন, যেমন—কোন সময় মিডিয়ামের দুপাশে দুজন লোক বসে তাঁদের হাত দিয়ে মিডিয়ামের হাত এবং পা দিয়ে মিডিয়ামের পা জড়িয়ে ধরে থাকেন। কোন সময় আবার মিডিয়ামের হাত পা ও সমস্ত শরীর চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়।

মিডিয়ামেরা অনেক সময় চালাকির আশ্রয় নেন বলে অবশ্য একথা মনে করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, যে একজন মিডিয়াম সব ঘটনাই চালাকির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অথবা সব মিডিয়ামই চালাকির আশ্রয় নেন। এমনও অনেক মিডিয়াম

ছিলেন যাঁদের বিরুদ্ধে চালাকির অভিযোগ কোন দিনই প্রমাণ করা যায়নি।

যাই হোক, আমি তোমাকে যে সব ঘটনা বলবো তার বেশীর ভাগই বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং অনেক সময় সেগুলি তাঁদের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতেই ঘটেছে, যেখানে মিডিয়ামদের জাল-জোচ্চুরি করবার সাজ সরঞ্জাম পাবার বা কিছু বন্দোবস্ত করবার কোন উপায় ছিলনা।

প্রথমেই স্যার্ উইলিঅ্যাম ক্রুক্স্, এফ. আর. এস.-এর লেখা 'রিসার্চেস্ ইন দি ফেনোমেনা অভ্ স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্' থেকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। এই ঘটনাগুলি প্রথমে কোয়র্টার্‌লি জার্ন্যাল অভ্ সায়েন্স-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

কেইট্ ফক্স, ড্যানিয়্যাল ডানগ্লাস হোম এবং ফ্লোরেন্স কুক্, এই তিনজন মিডিয়ামকে নিয়ে স্যার্ উইলিঅ্যাম ক্রুক্স্ পরীক্ষা করেছেন, এবং অনেক ঘটনা তাঁর নিজের বাড়ীর ল্যাবরেটরিতেই ঘটেছে। স্যার্ উইলিঅ্যাম লিখেছেন যে সাধারণত কোন ঘটনা ঘটবার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করত। এই হাওয়ায় মাঝে মাঝে কাগজ পত্রও উড়িয়ে নিত এবং থারমমিটারে দেখা যেত যে ঘরের তাপ বেশ কয়েক ডিগ্রি কমে গেছে।

কেইট্ ফক্সের নাম বোধহয় তোমার মনে আছে, যাদের বাড়ীর ভৌতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার রীতি আধুনিক কালে নতুন করে শুরু হয়। কেইট্ ফক্স ও তাঁর বোন মারগারেটা পরে ইউরোপ ও অ্যামেরিকার সর্বত্র মিডিয়াম হিসেবে ঘুরে বেড়ান।

স্যার্ উইলিঅ্যাম বহুদিন কেইটের ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা করেছেন। এই পরীক্ষার সময় তিনি দেখেছেন, যে কেইট্ অজ্ঞান অবস্থায় সোফায় পড়ে থাকবার সময়ও ঘরে নানা রমক অদ্ভুত

আওয়াজ হত—পিন ঠোকার মৃদু আওয়াজ থেকে শুরু করে লোহা পেটা ও পটকা ফাটার মত জোরে আওয়াজ। যত রকম উপায়ে সম্ভব স্যার্ উইলিঅ্যাম পরীক্ষা করেছেন এবং শব্দগুলি যে কোন রকম চালাকি দ্বারা কিম্বা কোন যন্ত্রপাতি দিয়ে করা হয়নি সে বিষয়ে তিনি শেষপর্যন্ত নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

যে শক্তি এই শব্দের সৃষ্টি করত তা যে একটা বুদ্ধিহীন শক্তি নয়, তারও প্রমাণ স্যার্ উইলিঅ্যাম পেয়েছেন। ক'বার, কোথায় শব্দ করতে হবে এবং আস্তে কি জোরে, যেভাবে অনুরোধ করা হয়েছে সেই ভাবেই শব্দ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সময় সময় একটা নির্দিষ্ট সংকেত অনুসারে শব্দ করে, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে সেই অদৃশ্য শক্তি।

ঘরের মধ্যে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নড়াচড়া করবার বহু ঘটনা তিনি দেখেছেন। ডায়ালেকৃটিক্ সোসাইটির সদস্যদের সঙ্গে একটা সীয়ান্সে, লোক বসে থাকা অবস্থায় কয়েকটা চেয়ার, আপনা থেকে ঘুরে গিয়ে টেবিলেব দিকে পেছন করে দাঁড়ালো, তারপর টেবিল থেকে ফুটখানেক দূরে সরে গেল। লোকেরা চেয়ারে পেছন দিকে মুখ করে, হাঁটুগেড়ে, হাত চেয়ারের পেছনে রেখে বসেছিলেন। অতএব তা:দের নিজেদের চেয়ার সরাবার কোন উপায় ছিলনা। তাছাড়া ঘরে ছিল পুরোপুরি আলো, এবং মিডিয়াম যাতে কোনরকম ছল চাতুরি করতে না পারে, তার জন্য নেওয়া হয়েছিল সব রকম সাবধানতা। এই রকম পরীক্ষা কয়েকদিন করা হয়।

অনেক সময় টেবিল, চেয়ার, মানুষ ইত্যাদি আপনা আপনি মাটির থেকে ওপরে উঠে যায়। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় 'লেভি-টেশন। ভারী একটা খাবার টেবিল মাটির থেকে দেড়ফুট উঠে যেতে দেখেছেন স্যার্ উইলিঅ্যাম, বেশ কয়েকবার।

চেয়ারে হাঁটুগেড়ে বসেথাকা অবস্থায় একজন ভদ্রমহিলা চেয়ার শুদ্ধু মাটি থেকে ইঞ্চি তিনেক উঠে, দশ সেকেণ্ড শূন্যে ঝুলেছিলেন। দুটো ছোট ছেলেকেও এভাবে উঠে যেতে দেখেছেন স্যার্ উইলিঅ্যাম।

সবচাইতে চাঞ্চল্যকর ছিল মিডিয়াম, ডি. ডি. হোমের লেভি-টেশন। হোমকে, একবার চেয়ার ছেড়ে, একবার চেয়ারে হাঁটুগেড়ে বসে ও একবার চেয়ারে দাঁড়িয়ে থেকে, শূন্যে উঠে যেতে দেখেছেন স্যার উইলিঅ্যাম। হোমের লেভিটেশন আরও অনেকেই দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আর্ল অভ্ ডানর‍্যাভেন, লর্ড লিণ্ডসে এবং ক্যাপটেন সি. ওয়াইনের নাম সুপরিচিত।

হোমের লেভিটেশন সম্পর্কে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় লিখেছে যে ক্রুক্স্-এর রিপোর্ট থেকে আর্ল অভ্ ডানর‍্যাভেন ও আরও দুজন সাক্ষীর রিপোর্ট আরও বেশী চাঞ্চল্যকর। তাঁরা বলেছেন হোমকে যে মাটি থেকে সত্তর ফিট উঁচু একটা জানালা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সাত ফিট দূরে আর একটা জানালা দিয়ে ঢোকানো হয়েছিল এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ।[১]

মিডিয়ামের উপস্থিতিতে ছোটখাটো জিনিস নড়াচড়া করার ব্যাপারে স্যার্ উইলিঅ্যাম লিখেছেন যে তাঁর নিজের হাতে উল্টোকরে ধরে থাকা অ্যাকরডিয়ান (বাজনা) আপনার থেকেই বাজতে শুরু করেছে। সেই অ্যাকরডিয়ানটাই পরে আবার বাজতে বাজতে সারা ঘরে ভেসে বেড়িয়েছে। নিজের থেকে জানালার পর্দা সরে যাওয়া, খড়খড়ি খুলে যাওয়া, পিয়ানো বাজা, জলের বোতল, গ্লাস টেবিলের ওপর থেকে উঠে যাওয়া, পাখার বাতাস করা এবং দেওয়ালে আঁটা কাচের বাক্সে পেণ্ডুলাম নড়ে যাওয়া ইত্যাদি বহু ঘটনা স্যার্

উইলিঅ্যামের নিজের বাড়ীতে ঘটেছে, যেখানে মিডিয়ামের কোন রকম প্রস্তুতি করবার সুযোগ সুবিধে ছিলনা।

অন্ধকার ঘরে স্যার্ উইলিঅ্যাম, ছোট টুকরো টুকরো উজ্জ্বল মেঘের মত আলো ভেসে বেড়াতে দেখেছেন। এই আলো আবার সময় সময় মানুষের হাতের আকার ধারণ করে ছোট ছোট জিনিস ঘরের এক দিক থেকে আর এক দিকে নিয়ে গেছে।

ঘরে আলো থাকা অবস্থাতেও তিনি পরিষ্কার মানুষের হাত দেখতে পেয়েছেন। সময় সময় মনে হয়েছে হাতগুলি নীহারিকার মত মেঘ দিয়ে তৈরী। কোন সময় আবার সেগুলিকে সাধারণ মানুষের হাতের মতই মনে হয়েছে, তবে হাতগুলি কব্জির কাছে, কিম্বা আর একটু পরে উজ্জ্বল মেঘের টুকরোয় মিলিয়ে গেছে। এই সব হাত স্পর্শ করে স্যার্ উইলিঅ্যাম দেখেছেন যে সময় সময় সেগুলি বরফের মত ঠাণ্ডা আবার সময় সময় সেগুলি সাধারণ মানুষের হাতের মতই গরম ও জীবন্ত।

স্যার্ উইলিঅ্যাম লিখেছেন, 'I have retained one of these hands in my own, firmly resolved not to let it escape. There was no struggle or effort made to get loose, but it gradually seemed to resolve itself into vapour, and faded in that manner from my grasp.'

(এর একটা হাত আমি নিজের হাতে ধরেছিলাম—কিছুতেই পালাতে দেবোনা এই সঙ্কল্প করে। নিজেকে ছাড়াবার জন্য কোন রকম ধস্তাধস্তি বা চেষ্টা না করে, হাতটা ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হয়ে আমার হাতের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।)

নিজে নিজে লেখা হয়ে যাবার ব্যাপারে স্যার্ উইলিঅ্যাম বলেছেন যে অন্ধকারে অনেকবার বিশেষ কড়াকড়ি অবস্থার মধ্যে তাঁর চিহ্ন দেওয়া কাগজে একটা শব্দ কিম্বা কথা লেখা হয়েছে এবং তিনি লেখার আওয়াজও শুনতে পেয়েছেন।

একদিন কেইট্ ফক্সের সীয়ান্সে, অন্ধকার ঘরে, একটা উজ্জ্বল হাত ঘরের ওপর থেকে নেমে এসে স্যার্ উইলিঅ্যামের হাত থেকে পেন্সিল নিয়ে, টেবিলের ওপর রাখা কাগজে তাড়াতাড়ি করে খানিকটা লিখে, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ঐ সময় উইলিঅ্যাম এক হাত দিয়ে মিস্ ফক্সের দুটো হাত ধরে রেখেছিলেন এবং মিস্ ফক্সের পা দুটো তাঁর পায়ের ওপর রাখা ছিল। ঘরে স্যার্ উইলিঅ্যামের স্ত্রী এবং আর একজন আত্মীয়া ছিলেন।

আর একদিন স্যার্ উইলিঅ্যামের নিজের ঘরে, আলোতে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর বন্ধুও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন সেদিন। টেবিলের উপর একটা পেন্সিল ও কয়েকটা কাগজ রাখা ছিল। সীয়ান্সটা হয় ডি. ডি. হোমকে নিয়ে। কিছু ব্যাপারে সেদিন বোঝা যায় যে অদৃশ্য শক্তিটা খুব জোরাল ছিল। স্যার্ উইলিঅ্যাম অদৃশ্য শক্তিকে অনুরোধ করলেন যে লেখাটা কি করে হয় তা তিনি পরিষ্কার ভাবে দেখতে চান। সাঙ্কেতিক শব্দে উত্তর এলো 'আমরা চেষ্টা করবো।'

এই উত্তর আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেন্সিলটা খাড়া হয়ে দাঁড়ালো টেবিলের ওপর। তারপর কেমন যেন দ্বিধাভরে ঝাঁকি দিতে দিতে কাগজটার দিকে এগিয়ে গেল এবং কাগজের কাছে পৌঁছেই ঠক্ করে পড়ে গেল। তিনবার হল এই রকম। তারপর দেখা গেল যে টেবিলের ওপর রাখা একটা কাঠের ছিল্‌কা আপনা থেকে ঘষটাতে ঘষটাতে এগোতে লাগলো পেন্সিলটার দিকে এবং কাছে এসে ওপরে উঠে গেল অল্প খানিকটা। পেন্সিলটাও আবার উঠে কাঠের ছিল্‌কাটায় ঠেকা দিয়ে দাঁড়ালো। দুটোয় মিলে

কাগজে লিখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পেন্সিলটা পড়ে যায়। এই ভাবে তিনবার চেষ্টা করেও লেখা হল না। তখন পেন্সিলটা কাগজের ওপর পড়ে রইল এবং কাঠের ছিল্‌কাটা ঘষটাতে ঘষটাতে চলে গেল আগের জায়গায়।

একটু পরেই অদৃশ্য শক্তি সাঙ্কেতিক আওয়াজ করে জানালো, 'তোমরা যা বল তাই আমাদের করতে হয়, কিন্তু আমাদের শক্তি শেষ হয়ে গেছে।'

একদিন এক ভদ্রমহিলা প্ল্যানশেটে লেখার সময় স্যার্‌ উইলিঅ্যাম ভাবলেন কি করে প্রমাণ করা যায় যে লেখাটা তার অচেতন মন থেকে আসছে না। অদৃশ্য শক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এ ঘরের জিনিজপত্র সব দেখতে পাচ্ছেন ?'

জবাব এলো 'হ্যাঁ'।

স্যার্‌ উইলিঅ্যামের পেছনে একটা টেবিলের ওপর টাইম্‌স্‌ কাগজটা রাখা ছিল। তিনি কাগজের দিকে না তাকিয়ে, হাত পেছনে নিয়ে একটা আঙুল কাগজে ঠেকিয়ে আবার সেই অদৃশ্য শক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি কাগজটা দেখতে পান, যাতে পড়তে পারেন ?'

আবার জবাব এলো 'হ্যাঁ।'

স্যার্‌ উইলিঅ্যাম বলেন, 'বেশ, দেখতে যদি পান, তাহলে আমার আঙুলে যে শব্দটা ঢাকা পড়েছে সেটা পড়ুন ত' দেখি। তাহলে আমি আপনার কথা বিশ্বাস করবো।'

প্ল্যানশেটে ধীরে ধীরে লেখা হল 'হাওএভার'।

স্যার উইলিঅ্যাম পেছন ফিরে আস্তে আস্তে আঙুল সরিয়ে দেখেন, লেখা আছে 'হাওএভার।'

স্যার্ উইলিঅ্যামের বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যায় মিস্ ফক্সের সীয়ান্স বসাবার কথা ছিল। স্যার্ উইলিঅ্যাম লাইব্রেরীতে বসে লিখছিলেন। তাঁর দুই ছেলে, একজনের বয়স চোদ্দ আর একজনের এগারো, এবং একজন ভদ্রমহিলা, খাবার ঘরে বসেছিলেন। সে ঘরেই বরাবর সীয়ান্স বসতো।

ঘোড়ার গাড়ী ঢুকবার ও ঘণ্টার আওয়াজ পেয়ে, স্যার্ উইলিঅ্যাম নিজেই দরজা খুলে মিস্ ফক্সকে সোজা খাবার ঘরে নিয়ে বসালেন। তারপর ছেলে দুটিকে লাইব্রেরীতে পড়তে পাঠিয়ে দরজা লক্ করে চাবি পকেটে রেখে দিলেন। সীয়ান্সে বসবার সময় তিনি সব সময়েই তাই করতেন।

স্যার্ উইলিঅ্যাম মাঝখানে বসলেন, তার এক পাশে মিস্ ফক্স আর এক পাশে, ছেলেদের সঙ্গে যে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তিনি। স্যার্ উইলিঅ্যাম, মিস্ ফক্সের হাত দুটো ধরে বসেছিলেন।

অদৃশ্য শক্তি সঙ্কেত করে প্রথমে আলো নেবাতে বলে এবং তার একটু পরেই বলে, 'আমাদের শক্তি দেখাবার জন্য আমরা একটা কিছু নিয়ে আসবো।'

অল্পক্ষণ পরেই ঘরের মধ্যে একটা ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেলেন সবাই। তারপর ঘণ্টাটা বাজতে বাজতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো—কখনও কাছে কখনও দূরে, কখনও ওপরে কখনও নীচে, কখনও দেওয়ালে বা মেঝেতে ধাক্কা খায়, কখনও বা আবার যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মাথায় লাগে। পুরো পাঁচ মিনিট ঘুরে বেড়িয়ে ঘণ্টাটা এসে পড়ল টেবিলের ওপর, স্যার্ উইলিঅ্যামের হাতের কাছে।

স্যার্ উইলিঅ্যাম ভাবেন এটা তাঁর ঘণ্টা হতে পারেনা, কেননা একটু আগেই তিনি ওটা লাইব্রেরীতে দেখে এসেছেন।

আলো জ্বেলে তিনি দেখেন যে তাঁর ঘণ্টাটাই টেবিলের ওপর পড়ে আছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই লাইব্রেরীতে যান এবং দেখেন যে ঘণ্টাটা তিনি যেখানে দেখেছিলেন সেখানে নেই।

তখন তিনি বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে দেখেছে নাকি ঘণ্টাটা।

ছেলেটি আঙুল দিয়ে দেখায় 'ঐ ত' ঘণ্টা।' তার পরেই তাকিয়ে দেখে বলে, 'না, নেইত! কিন্তু একটু আগেও ত' ওটা ওখানে ছিল।'

'কেউ কি এসেছিল এই ঘরে?' জিজ্ঞাসা করেন স্যার্ উইলিঅ্যাম।

ছেলেটি জবাব দেয়, 'না, কেউ ত' আসেনি। আমি ঠিক জানি যে ওটা ওখানেই ছিল, কেননা আপনি যখন আমাদের খাবার ঘর থেকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন 'জে' এসেই ওটা বাজাতে শুরু করে এবং পড়ার অসুবিধা হয় বলে আমি ওকে বাজানো বন্ধ করতে বলি।'

স্যার্ উইলিঅ্যামের ছোট ছেলেও তার দাদার কথা সমর্থন করে বললো, যে ঘণ্টাটা যে জায়গায় ছিল, সে আবার সেই জায়গাতেই রেখে দিয়েছিল।

এবার একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা শোনো। মিডিয়াম ফ্লোরেন্স কুক্-এর উপস্থিতিতে একটি আত্মা মূর্তি ধারণ করত, পুরোপুরি একটি মেয়ের রূপ, যে নিজেকে কেটি কিং বলে পরিচয় দিত এবং হেঁটে চলে, কথা বলে বেড়াতো। আত্মার মূর্তি ধারণ করাকে, তা পুরোপুরিই হোক, বা আংশিকই হোক ইংরেজীতে বলে মেটিরিয়্যালাইজেশন্।

একদিন সন্ধ্যার পর কেটি প্রায় দুঘণ্টা ধরে, ঘরে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পায়চারি

করল। স্যার্ উইলিঅ্যাম তার পাশে পাশে ছিলেন এবং অনেক সময়েই কেটি তাঁর হাত ধরে হাঁটছিল। স্যার্ উইলিঅ্যামের মনে হচ্ছিল যে জীবন্ত ভদ্রমহিলা একজন যেন তাঁর পাশে পাশে হাঁটছেন, পরলোকের কোন সাক্ষাৎকারী নয়। কেটির মত নিয়ে একবার ত' স্যার্ উইলিঅ্যাম তাঁকে আলিঙ্গনই করলেন।

তারপর কেটি বলল যে সে একই সঙ্গে নিজেকে ও ফ্লোরেন্স কুক্‌কে দেখাবে, এবং স্যার্ উইলিঅ্যামকে আলো নিবিয়ে দিয়ে একটা ফস্‌ফরাসের বাতি নিয়ে ছোট ঘরে যেতে বলল। এই ছোট ঘরটা ছিল স্যার্ উইলিঅ্যামের লাইব্রেরী, আর যে ঘরে তাঁরা সবাই ছিলেন সেটা ছিল তাঁর ল্যাবরেটরি। কেটির যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুই ঘরের মধ্যে দরজাটা খুলে ফেলে সেখানে একটা পর্দা খাটানো হয়েছিল।

স্যার্ উইলিঅ্যাম অন্ধকারে সাবধানে গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন যে ফ্লোরেন্স মাটিতে পড়ে আছেন। তার পরনে ছিল কালো ভেলভেটের পোশাক। আলোটা মুখের কাছে নিয়ে হাত ধরে স্যার্ উইলিঅ্যাম দেখেন যে তার জ্ঞান নেই এবং নিশ্বাস ধীরে ধীরে পড়ছে। তারপর আলোটা উঁচু করে ঘুরিয়ে দেখেন যে কেটি কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, তার পরনে ছিল সাদা পোশাক। বার বার করে তিনি দুজনকে একের পর এক ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন।

একটু পরেই মিস্ কুক্ নড়ে চড়ে উঠলেন এবং কেটি—সঙ্গে সঙ্গেই স্যার্ উইলিঅ্যামকে সরে যেতে অনুরোধ করে। তাদের আর দেখা যায় না এমন এক জায়গায় সরে গেলেন স্যার্ উইলিঅ্যাম, কিন্তু যতক্ষণ না ফ্লোরেন্স জেগে উঠল, এবং দর্শকদের মধ্যে দুজন আলো নিয়ে ঘরে এলো, ততক্ষণ তিনি ঐ ঘরেই ছিলেন।

স্যার্ উইলিঅ্যাম পাঁচটা ক্যামেরা একসঙ্গে ব্যবহার করে কেটির অনেকগুলো ফটোও তুলেছিলেন। এই ফটোগুলির মধ্যে কেটি আর মিস্ কুকের একত্র হওয়ার ফটোটাও আছে।"[১]

সুশান্ত নড়ে চড়ে বসে বলে, "এ ভাই বিশ্বাস করা যায় না। কি করে এরকম হতে পারে?"

"সাধারণ কেউ একথা বললে আমিও হয়ত বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু স্যার্ উইলিঅ্যামের মত লোক যাঁর সঙ্গে সরকার বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পদে পদে পরামর্শ করতেন তিনি ত' আর একটা বাজে কথা বলবেন না। আর তাঁরই বাড়ীতে একজন মিডিয়াম এসে তাঁর মত একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককে ছল চাতুরি করে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে দেবে তাও অসম্ভব। তা ছাড়া এই ধরনের অভিজ্ঞতা ত' শুধু স্যার্ উইলিঅ্যাম ক্রুক্স্-এর একার হয়নি, আরও অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা ও বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা এ ধরনের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, ফ্রেড্রিক মায়ার্স, লম্‌ব্রসো, উইলিঅ্যাম জেইম্স্, স্যার্ উইলিঅ্যাম ব্যারেট্, চার্লস রিচেট্ এবং স্যার্ অলিভার লজ।

১৯৩০ সালে, মায়ার্সের স্মৃতি-সংক্রান্ত একটা আলোচনায় স্যার্ অলিভার লজ, মায়ার্স, চার্লস রিচেট্ এবং তাঁর নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আরও অনেক কথার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, 'An ectoplasmic hand which he (Myers) had strongly held and determined not to

---

'Researches in the Phenomenon of Spiritualism'—Sir William Crookes, F. R. S. [Printed from the Quarterly Journal of Science] London R. N. S. Southampton Row, Holborn, W. C. 1874. Page 86-94, 96-97 and 106-108.

let go, had dematerialised in his grasp; and this had struck him more than the more normal kind of movements which I had witnessed, such as might be accomplished by liberated or by extra and temporary limbs—that is to say phenomena like hand-grasps, strong clutches, carrying things about, and so on, which would be quite feasible to any normal person who was free to move where he chose.'

(একটা এক্টোপ্লাজম্-এর হাত যেটা তিনি (মায়ার্স) কিছুতেই ছাড়বেন না এই সঙ্কল্প করে ধরেছিলেন, সেটা তাঁর হাতের মধ্যেই মিলিয়ে গেল; এই ব্যাপারে তিনি অনেক বেশী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, অন্য বেশী সাধারণ নড়াচড়ার ব্যাপারগুলির থেকে, যেগুলি আমি দেখেছিলাম এবং যেগুলি মুক্ত কিম্বা সাময়িক বাড়তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা করা সম্ভব হয়—অর্থাৎ হাত ধরা, খাবল মারা, জিনিসপত্র ধরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি, যা ইচ্ছামত চলতে ফিরতে পারে এমন একজন সাধারণ মানুষের দ্বারা করা সম্ভব।)

মিডিয়াম, ডাক্তার মঙ্ক্‌কে নিয়ে অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস কিছুদিন এসব ব্যাপার পরীক্ষা করেছেন। মেটিরিয়্যালাইজেশন্ অর্থাৎ মূর্তি ধারণ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথায় তিনি বলেছেন, যে প্রথমে মঙ্কের কোটের কাছে সাদা বাষ্পের মত একটা জিনিস জড়ো হতে দেখা যেত। ক্রমে সেটা ঘন হত এবং তুষার কণার মত সাদা সাদা কণা হাওয়ায় নড়েচড়ে মাটি থেকে মিডিয়ামের কাঁধ পর্যন্ত একটা থামের মত হত। তারপর সেটা সরে গিয়ে ধীরে ধীরে

সাদা পোশাক পরা একটি স্ত্রীলোকের মূর্তি ধারণ করত। খানিক পরে আবার ঐ মূর্তি মিডিয়ামের শরীরে মিলিয়ে যেত।[১]

স্বামী অভেদানন্দ, নিউইয়র্কের লিলিডেল বলে জায়গায় মিসেস্ মসের এক সীয়ান্সে বলরাম বসুকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। জীবিত অবস্থার মতই সাদা পাগড়ী মাথায়, দাড়ি গোঁফে ঢাকা গম্ভীর মুখ বলরাম বসু, কিন্তু কোন কথা বলেননি তিনি। মাথা নেড়ে স্বামীজীর প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন এবং মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। পরে কুয়াসার মত মিলিয়ে যান। মিডিয়াম তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। বলরাম বসু কথা না বলায় স্বামীজী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু পরে জানলেন যে তিনি ডবল নিউমোনিয়ায় মারা যান এবং মারা যাবার আগে সাত দিন কথা বলতে পারেননি।[২]

অটমেটিক স্লেইট্ রাইটিং-এর কথা তোমায় আগে বলিনি। এটাও একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। ছুটো স্লেইট্ পরিষ্কার করে একটার ওপর আর একটা রাখা হয় এবং ছুই স্লেইটের মাঝে রাখা হয় স্লেইট্ পেন্সিলের ছোট একটা টুকরো। মিডিয়াম কিম্বা মিডিয়াম ও একজন সিটার ছুজনে ধরে থাকেন স্লেইট্ ছুটো। সিটার যা জানতে চান সেই প্রশ্নগুলি একটা কাগজে লিখে স্লেইটের ওপর রাখা হয়। সময় সময় মুখে মুখেই করা হয় প্রশ্ন। তারপর

---

১) 'Thirty Years of Psychical Research'—Being a Treatise on Metapsychics by Charles Richet, Ph. D., Translated from the French by Stanley De Brath M. Inst. C. E. W. Collins Sons & Co. Ltd. Publisher. 1923 Page 477.

লেখার আওয়াজ শোনা যায় এবং লেখা শেষ হলে স্লেইট্ খুললেই দেখা যায় যে প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে স্লেইটে।

অটমেটিক স্লেইট্ লেখার ব্যাপারে স্বামী অভেদানন্দের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগষ্ট, স্বামীজী লিলিডেল-এ, মিঃ কিলার নামে এক মিডিয়ামের কাছে গিয়েছিলেন। তুটো স্লেইটের মধ্যে এক টুকরো পেন্সিল ঢুকিয়ে টেবিলের থেকে একটু উঁচু করে তুজনে ধরে রইলেন। স্লেইট্ তুটোর ওপরে রাখা ছিল একটা ভাঁজ করা কাগজে স্বামীজীর লেখা স্বর্গীয় স্বামী যোগানন্দের উদ্দেশে, বাংলায় কয়েকটা প্রশ্ন। একটু পরেই তাঁদের তুজনের ইলেক্ট্রিক্ শকের মত একটা অনুভূতি হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই লেখার আওয়াজও এলো কানে। লেখা শেষ হলে স্লেইট্ তুটো নামিয়ে তাঁরা দেখলেন যে তাতে, সংস্কৃত, গ্রীক, ইংরেজী ও বাংলা এই চার ভাষায় লেখা রয়েছে। লিলিডেল-এ কেউ সংস্কৃত কি বাংলা জানতনা। ইংরাজী ও বাংলা হাতের লেখাও স্বামী যোগানন্দের লেখার মত। স্বামীজী ঐ স্লেইট্ তুটো নিয়ে গিয়েছিলেন এবং একটা সীয়ান্সে জানতে পারেন যে ঐ গ্রীক লেখাটা ছিল একজন গ্রীক দার্শনিকের প্রেতাত্মার লেখা যিনি স্বামী যোগানন্দের প্রেতাত্মার সঙ্গে এসেছিলেন। পরে একজন অধ্যাপক লেখাটা দেখে বলেছিলেন যে ওটা প্লেটোর একটা সুন্দর রচনা—নির্ভুলভাবে লেখা।[১]

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায় সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির অধিবেশনে, বহু গণ্য মান্য অতিথিদের সমাবেশে, স্বামী অভেদানন্দ

একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতায়, অ্যামেরিকায় কয়েকটা সীয়ান্সে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তিনি তার উল্লেখ করেন। এরই একটা ঘটনা শোনো।

কোন একটা সীয়ান্সে, স্বামীজী অন্ধকার ঘর ছেড়ে তাঁর আগের আসনে বসতে গিয়ে দেখেন যে একটি মেয়ে বসে রয়েছে তাঁর চেয়ারে। একটু লক্ষ্য করেই তিনি বুঝতে পারেন যে মেয়েটি রক্ত মাংসের মানুষ নয়; কোন প্রেতাত্মা দেহ ধারণ করে এসেছে। তিনি কাছে যেতেই মেয়েটি উঠে হ্যাণ্ড শেইক্ করল। মানুষের মতই গরম তার হাত। কিন্তু পরমুহূর্তেই হাতটা মিলিয়ে গেল স্বামীজীর হাতের মধ্যেই। মেয়েটিও অদৃশ্য হয়ে গেল।[১]

সখের যাত্নকর, মিঃ হ্যারি প্রাইস্ ছিলেন এই সব অতি প্রাকৃত ক্রিয়াকলাপের একজন বিশিষ্ট তদন্তকারী। যাত্নবিদ্যায় জ্ঞান থাকার জন্য তিনি অনেক সময় মিডিয়ামদের ছল চাতুরি ধরে ফেলতেন। হ্যারি প্রাইস্ ছিলেন ন্যাশনাল্ ল্যাবরেটরি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের ডিরেকটর, যেটা ১৯৩৪ সালে য়ুনিভার্সিটি অভ্ লণ্ডন কাউন্সিল ফর সাইকিক্যাল ইনভেসটিগেশনে পরিণত হয়।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, মিঃ প্রাইস্ খবর পান যে এক বাড়ীতে সপ্তাহে একদিন রাত্রে ঘরোয়া সীয়ান্স বসে এবং সেখানে একটি মেয়ের আত্মা শরীর ধারণ করে। মেয়েটি মারা গিয়েছে ১৯২০ সালে এবং ১৯২৫ সাল থেকে সে সপ্তাহে একদিন করে তার মা ও আত্মীয় স্বজনদের দেখা দিয়ে যায়।

মিঃ প্রাইস্ একদিন ঐ সীয়ান্সে যান। সীয়ান্স শুরু হবার আগে তিনি ঘর ও সমস্ত ফার্নিচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলেন এবং জানালাগুলি সব বন্ধ করে দিলেন। তারপর দরজা জানালায় ফিতে লাগানো, মেঝেতে ময়দা ছিটানো ইত্যাদি নানা রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলেন যাতে না জানিয়ে কেউ বাইরে থেকে আসতে না পারে।

সীয়ান্স শুরু হবার একটু পরেই মিঃ প্রাইস্ একটি ছোট মেয়ের শরীর ধারণ করা দেখতে পেলেন। মেয়েটির মার মত নিয়ে তিনি মেয়েটিকে ধরে দেখলেন ও পরে তাকে নিজের কোলে বসালেন। মেয়েটির বুকে কান ঠেকিয়ে তিনি হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং হাত দিয়ে নাড়িও দেখলেন। অল্প-সল্প কথাও বলল মেয়েটি। পরে মেয়েটির মা কাঁদতে কাঁদতে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন। ঘরে যাঁরা ছিলেন সকলেই কাঁদছিলেন।

"প্রায় পাঁচ মিনিট পরে মেয়েটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।[১]

মার্জারী ক্র্যাণ্ডন্ বলে বোষ্টনের এক মিডিয়ামের সীয়ান্সে তার পরলোকগত ভাই, ওয়াল্টারের আত্মার আবির্ভাব হত, যে নিজের স্বরে কথা বলতে ও নানা রকম কাজ করতে পারত। সীয়ান্স শুরু হবার আগে এক বাটি গলানো মোম রেখে দিলে তাতে ওয়াল্টারের হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ পড়ে যেত। একবার তদন্তকারীরা সীয়ান্সে একজন ফিঙ্গার প্রিণ্ট এক্সপার্ট রাখেন। সীয়ান্স শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে উপস্থিত সকলের বুড়ো আঙুলের ছাপ তোলেন এবং ঐ মোমের ওপর ছাপের সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে দেখেন। কিন্তু কারো আঙুলের ছাপের সঙ্গে সেটা মেলেনি।

পরে ওয়াল্টারের ব্যবহার করা জিনিসপত্র, বিশেষ করে তার দাড়ি কামানো খুরের ওপর অন্তর্নিহিত ছাপ উঠিয়ে নিয়ে দেখা গেল যে সেই ছাপের সঙ্গে মোমের ওপরের ছাপ সর্বতোভাবে মিলে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বাটিতে যে গলানো মোম রাখা হয়েছিল তা তদন্তকারীদের তত্ত্বাবধানেই রাখা হয়েছিল, তার ওপর আগে কোন ছাপ ছিলনা।[১]

প্রখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক চার্লস রিচেট্ অতি প্রাকৃত ক্রিয়া-কলাপের একজন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী হিসাবে খুব নাম করেছিলেন। 'থার্টি ইয়ারস্ অভ্ সাইকিক্যাল রিসার্চ' নামে একটা বইও তিনি লিখেছেন।

চার্লস রিচেট্ একদিকে ছিলেন একজন প্রখ্যাত ফিজিওলজিষ্ট (শারীরবৃত্তবিৎ), প্যাথলজিষ্ট (রোগবিত্তাবিৎ) এবং সাইকোলজিষ্ট (মনস্তত্ত্ববিৎ)। অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন বড় কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। বিমান চলাচলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক এবং বিশ্ব শান্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত কর্মী। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে, তিনি মেডিসিন (ওষুধ)-এ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

মেটিরিয়্যালাইজেশন্ অর্থাৎ প্রেতাত্মার শরীর ধারণ করা সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন শোনো। কথাটা অবশ্য একটু ভুল হল। মিঃ রিচেট্ প্রেতাত্মার অস্তিত্ব মানতেন না। তিনি বলতেন মিডিয়ামের শরীর থেকে এক্টোপ্লাজম্ বলে একটা জিনিস বের হয় এবং তার থেকেই এই শরীর তৈরী হয় অল্প সময়ের জন্য। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এটা কোন বৈজ্ঞানিক কারণবশতই হয় যা এখনও জানা যায় নি। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে

---

১) 'Guide to Modern Thought'—C. E. M. Joad. Pan Books Ltd, publisher. 1948. Page 214-216.

ওপর ওপর বিচার করলে প্রেতাত্মার অস্তিত্বই এই ব্যাপারের কারণ বলে মনে হয়।

তিনি লিখেছেন, 'মনস্তত্ত্বের ও শারীরতত্ত্বের দিক থেকে এ ব্যাপারের অযৌক্তিকতা বা অসম্ভাব্যতার কথা লিখে আমি সময় নষ্ট করবোনা। আমাদের চোখের ওপর মূর্তি ধারণ করেছে একটা জীবন্ত প্রাণী কিম্বা একটা জীবন্ত জিনিস—যার তাপ আছে, আপাতদৃষ্টিতে রক্তসঞ্চালন হয়, শ্বাস প্রশ্বাস বয় (যা আমি বিয়েন বোয়ার মূর্তিকে ব্যারিটা[১] জল রাখা বোতলে নিঃশ্বাস ফেলতে দিয়ে প্রমাণ করেছিলাম), যার এক রকম ব্যক্তিত্বও আছে এবং মিডিয়ামের থেকে স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, এক কথায় একটা নতুন মানুষ। বিস্ময়কর জিনিসের মধ্যে নিশ্চয়ই এটা চরম। তা সত্ত্বেও এটা সত্যি।[২]

মিডিয়ামেরা ছল চাতুরি করে এরকম মানুষ সৃষ্টি করে কিনা সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন 'এ রকম প্রতারণা কি সম্ভব? আমি তা ভাবতে পারিনা। আমি যখন পুনরায় স্মরণ করি আমরা সকলে মিলে যে সব সাবধানতা অবলম্বন করেছি, একবার নয় বিশ বার, একশবার এমন কি হাজার বার, এটা অসম্ভব যে সব বারই আমরা প্রতারিত হয়েছি।[৩]

১) ব্যারিটা হচ্ছে বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড। এটা জলে গলে যায়। একটা বোতলে ব্যারিটা গোলা জল রেখে তাতে নিঃশ্বাস ছাড়লে নিঃশ্বাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে মিলে বেরিয়াম কার্বনেট তৈরী হয় এবং সেটা তলায় জমে যায়।

২) 'Thirty Years of Psychical Research' Being a Treatise on Metapsychics by Charles Richet, Ph. D., Translated from the French by Stanley De Brath M. Inst. C. E. W. Collins Sons & Co. Ltd, Publisher. 1923. Page 466-467.

৩) Ibid. Page 467.

এবার মিঃ রিচেটের অভিজ্ঞতার কথা বলি।

সুবিখ্যাত মিডিয়াম, ইউস্যাপিয়া প্যালাডিনোকে নিয়ে প্যারিসের সাইকোলজিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের একটা সীয়ান্স হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মিঃ রিচেট্‌, ম্যাডাম কুরি, আরও দুজন ভদ্রমহিলা এবং ঐ ইন্‌স্টিটিউটের সেক্রেটারি। মিডিয়ামের পেছনে ডবল পর্দা খাটানো ছিল এবং ঘরে মৃদু হলেও যথেষ্ট আলো ছিল। মিঃ রিচেট্‌ ও ম্যাডাম কুরি দুজনে মিডিয়ামের দুই হাত ধরে ছিলেন।

সীয়ান্স শুরু হবার একটু পরেই মিডিয়ামের পেছনের পর্দার একটা জায়গা ফুলে উঠতে দেখা গেল—হাত দিয়ে ঠেলা দিলে যেমন হয়। মিঃ রিচেট্‌ বাঁ হাতে মিডিয়ামের হাতটা ধরে রেখে ডান হাতে পর্দার ফোলা জায়গাটা ধরলেন। তাঁর মনে হল সেটা একটা হাত, হাতের আঙুলগুলিও বুঝতে পারলেন তিনি।

মিঃ রিচেট্‌ তখন বললেন, 'এই হাতে আমি একটা আংটি দেখতে চাই' এবং সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলেন যে আঙুলে একটা আংটি এসে গেছে।

তারপর তিনি বললেন, 'একটা ব্রেসলেট' এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাতের কব্জিতে অনুভব করলেন একটা ব্রেসলেট।[১]

এখন শোনো ভৌতিক হাত পা দিয়ে মোমের মোজা তৈরীর ব্যাপার।

১৯২১ সালে, প্যারিস মেটাসাইকিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টার, গুস্তাভ গেলে এবং চার্লস রিচেট্‌ ঐ ইন্‌স্টিটিউটে ক্লুস্কির ক্রিয়াকলাপ

---

১) 'Thirty Years of Psychical Research' Being a Treatise on Metapsychics by Charles Richet, Ph. D;. Translated from the French by Stanley De Brath M. Inst. C. E. W. Collins Sons & Co. Ltd, Publisher. 1923. Page 496.

পরীক্ষা করেন। ক্লুস্কি ছিলেন একজন পোলিশ মিডিয়াম—পুরুষ।

সীয়ান্সের সময় মিঃ রিচেট্ ও মিঃ গেলে মিডিয়ামের হাত ছুটো শক্ত করে ধরেছিলেন। খনিজ মোম গালিয়ে একটা বাসনে করে রাখা ছিল ঘরে।

প্রথমে দেখা গেল যে আপনা আপনি একটা হাতের ছাঁচ বা হাত মোজা তৈরী হল। তারপর হল ডান, বাঁ—তুহাতেরই মোজা। তারপর হল একটা পায়ের মোজা। হাতের ছাঁচে প্লাস্টার ঢালাই করে দেখা গেল যে তার মধ্যে হাতের শিরা এবং চামড়ার ভাঁজের ছাপ সব পরিষ্কার উঠেছে।

মোমের ছাঁচগুলি যে এই সীয়ান্সেই তৈরী হয়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য মিঃ রিচেট্ ও মিঃ গেলে গালানো মোমের সঙ্গে কোলেস্টেরিন বলে একটা জিনিস মিশিয়ে দিয়েছিলেন যা মোমের সঙ্গে মিলে যায় এবং মোমের রঙ আগের মতই থাকে, কিন্তু পরে সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে মোমের রঙ লালচে বেগনী হয়ে যায়।

কব্জির কাছে ঐ ছাঁচ বা মোজাগুলি সরু, সেজন্য নানা রকম বন্দোবস্ত ছাড়া, ছাঁচ না ভেঙ্গে সাধারণ একটা হাত বের করে নেওয়া অসম্ভব।

এই পরীক্ষা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে মানুষের হাত পা আকার ধারণ করেছিল এবং পরে মিলিয়ে গিয়েছিল।[১]

মিঃ গেলের ও মিঃ রিচেটের এই পরীক্ষার কথাই লিখেছে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতে, যা আমাদের এই আলোচনার প্রথমেই তোমাকে বলতে শুরু করেছিলাম। 'The most remarkable studies of materialization were made

১) Ibid. Page 543.

in France by G. Gelley and Richet. Wax gloves have been produced that are reported to have been made by spirit hands dipped into molten wax and dematerialized after the wax solidified.'[১]"

[আত্মার শরীর ধারণ করার বিষয়ে জি. গেলে, এবং রিচেটের গবেষণাই সব চাইতে লক্ষণীয়। মোমের হাত মোজা উৎপাদিত হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, যে গালানো মোমে ভৌতিক হাত ডুবিয়ে সেগুলি তৈরী করা হয়েছে এবং মোম জমে যাওয়ার পর (হাত) মিলিয়ে গেছে।]

সুশান্ত চুপ করে থাকে আমি আবার বলতে শুরু করি,

"ফেনোমেনা অভ্ ফিজিক্যাল মিডিয়ামশিপ" অর্থাৎ মিডিয়াম অবস্থায় বাস্তব ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা এখানেই শেষ হল।

যোগী বা সাধুরা অনেক সময় মন্ত্রবলে বা ইচ্ছাশক্তি দিয়ে প্রেতাত্মাকে সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়ে পৃথিবীতে আনতে পারেন।

ঢাকার সরকারী উকিল রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ তিনবার বিয়ে করেন এবং কিছুদিন পর পর স্ত্রীরা সব মারা যান। এর পর তাঁর পরলোকগত প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করার ও কথা বলার খুব ইচ্ছা হয় এবং এ বিষয়ে জানবার জন্য তিনি তাঁর বন্ধু, ঠাকুর তরণীকান্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেন। ঠাকুর তরণীকান্ত যোগ ও তন্ত্র সাধনা করে বহু অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন এবং তিনি রায় বাহাদুরকে তাঁর পরলোকগত আত্মীয়স্বজনদের দেখাতে রাজী হলেন।

১৯১১ সালের ১৩ই আগষ্ট, সকাল আটটায়, একটা হলঘরে ঠাকুর তরণীকান্ত, রায়বাহাদুর ও একটি অল্প বয়সী ছেলে, তিনজনে একটা টেবিলের ওপর হাত ধরাধরি করে রেখে বসলেন। ঠাকুর

১) Encyclopaedia Britannica—Vol. 18. Page 720.

তরণীকান্ত প্রথমে মন্ত্র উচ্চারণ ও প্রার্থনা করলেন। পরে তিনজন চোখ বুজে বসে রইলেন।

একটু পরেই তাঁরা দেখলেন যে একজন বৃদ্ধের ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে,—ঈশ্বর বাবুর বাবা।

আধ মিনিট পরেই ছায়ামূর্তিটা মিলিয়ে গেল এবং একটি ছেলের ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হল,—ঈশ্বর বাবুর ছেলে।

আবার আধ মিনিট পরে ছেলের ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল এবং একসঙ্গে ঈশ্বর বাবুর তিন স্ত্রীর ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হল। বেঁচে থাকতে তাঁরা যেভাবে বেশভূষা করতেন সেই ভাবে। মিনিট তিনেক পরে প্রথম স্ত্রীর ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল। তারপর দ্বিতীয় স্ত্রীর। তৃতীয় স্ত্রীর মূর্তিকে সরতে দেখে ঈশ্বর বাবু চীৎকার করে ওঠেন, 'তুমি যেওনা, আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

এ কথায় তাঁর স্ত্রীর ছায়ামূর্তি নড়ে চড়ে উঠে কাছে বসা ছেলেটির শরীরে মিলিয়ে গেল। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেল ও তার হাত দুটি কাঁপতে লাগলো। ঠাকুর তরণীকান্ত টেবিলের ওপর একটা কাগজ পেতে ছেলেটির হাতে একটা পেন্সিল গুঁজে দিলেন।

তিনটি কথা লেখা হল কাগজে—(১) ভাল, (২) শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড, (৩) অসময়ে হয় নাই।

লেখা দেখে রায়বাহাদুর ভীষণ অবাক, তিনি যে তিনটি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন এগুলি তারই উত্তর। প্রশ্ন তিনটি ছিল—(১) আমার ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে চলবে? (২) কি ভাবে আমি তোমাদের পারলৌকিক সুখের উপায় করতে পারি? (৩) তোমাদের অকাল মৃত্যু হল কেন?[১]

---

১) পরলোকের কথা—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রণীত, ১৭৮—১৮১ পৃষ্ঠা। প্রকাশকঃ শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ, পত্রিকা হাউস, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৫৪।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত গণিতবিদ্ সোমেশ চন্দ্র বসুর দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তিনি ঠিক করেন যে এমন সাধুর কাছ থেকে দীক্ষা নেবেন যিনি তাঁকে ও তাঁর মৃতা স্ত্রীকে একসঙ্গে দীক্ষা দিতে পারবেন। বহু সাধু সন্ন্যাসীর কাছে তিনি গেলেন কিন্তু এ কথায় কেউই রাজী হলেন না। শেষ-মেষ ভোলানন্দ গিরি রাজী হলেন, তবে তিনি আগে থাকতেই বলে রাখলেন যে সোমেশ বাবু তাঁর স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবেন না।

দীক্ষার ঘরে তিনটে আসন পাতা হল এবং তার দুটোয় গিরি মহারাজ ও সোমেশ বাবু বসলেন। একটা খালি পড়ে রইল। একটু পরেই সোমেশ বাবু দেখেন যে তাঁর স্ত্রী পাশের খালি আসনটায় বসে আছেন। দীক্ষা শেষ হবার পর তাঁর স্ত্রীর মূর্তি মিলিয়ে গেল।[১]

এবার মেজর রায়ের অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা শোনো। মেজর রায়ের কথা মনে আছে নিশ্চয়, যাঁর টেলিপ্যাথির অভিজ্ঞতার কথা আগে বলেছিলাম?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, ১৯৪২ সালের মে মাসে, শ্রীরায় অল্প কিছুদিনের জন্য চাটগাঁর সীতাকুণ্ড নামে এক জায়গায় ছিলেন। এখানে একটা গরম জলের কুণ্ড ছিল, যার নাম সীতাকুণ্ড। সেই নামেই এই জায়গার নাম এবং এটা হিন্দুদের একটা তীর্থস্থান। এখানে পাহাড়ের ওপর ছিল একটা মহাদেবের মন্দির।

এই মন্দিরের মহান্তের সঙ্গে শ্রীরায়ের একদিন পরিচয় হয় এবং মহান্ত একদিন তাঁকে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর মহান্ত বলেন, 'আমার একটু কাজ আছে তাই তাড়াতাড়ি বের হতে হবে। আপনি আর সকলের সঙ্গে বসে গল্প করুন।'

---

১) 'ভারতের সাধক' (দ্বিতীয় খণ্ড)—শঙ্করনাথ রায় ২১৯ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: শ্রীসুধীর মুখার্জি, রাইটার্স সিণ্ডিকেট, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৪।

'এত রাত্রে আপনার আবার কি কাজ? যাবেনই বা কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন শ্রীরায়।

'শ্মশানে একটু কাজ আছে।'

'বেশ ত' চলুন না, আমিও যাই আপনার সঙ্গে।' উৎসাহিত হয়ে বলেন শ্রী রায়।

এবার গম্ভীর হয়ে যান মহান্ত, বলেন, 'আপনি সৈনিক, জানি যে আপনি প্রাণ নিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না, প্রাণ দিতেও ভয় পান না। কিন্তু এটা অন্য ধরনের ব্যাপার, এ আপনি পারবেন না।'

এতে শ্রী রায়ের রোখ যেন আরও বেড়ে যায়। তিনি অম্লান বদনে বলেন 'এর আগেও আমি কয়েকবার শ্মশানে গেছি, ভয় আমি পাবোনা।'

নেহাৎ নিরুপায় হয়ে মহান্ত বললেন, 'যেতে চান চলুন, কিন্তু কিছু হলে যেন আমায় দোষ দেবেন না।'

ঠিক হল শ্রীরায় মহান্তর বাড়ী অপেক্ষা করবেন, রাত্রি দশটায় মহান্ত ফিরে এসে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবেন।

মহান্তর বাড়ী থেকে শ্মশান প্রায় দুমাইল। আধ-মাইল পরিষ্কার রাস্তা, বাকি দেড় মাইল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ। জঙ্গল পেরিয়েই শ্মশান। টর্চের আলোয় যতদূর দেখা যায় ধূ-ধূ মাঠ, মাঝে মাঝে কালো কালো গর্ত আর ছোট ছোট ঝোপ। শীতের রাত্রে কুয়াসার জন্য বেশী দূর দেখা যায়না।

শ্মশানে পৌঁছে মহান্ত এক জায়গায় আসন পেতে বসলেন। তারপর সঙ্গে করে আনা একটা বড় ঝোলার থেকে থালা, বাটি, গেলাস নামিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার থেকে লুচি, মাংস, পায়েস ইত্যাদি বের করে সাজিয়ে রাখলেন। বোতলে করে জলও এনেছিলেন, গেলাসে ঢেলে দিলেন।

শ্রীরায় ত' অবাক, কিন্তু কোন কথা বললেন না তিনি। তাঁর মনে হল হয়ত শেয়ালকে খাওয়াবার জন্য এত আয়োজন, যাকে বলা

হয় শিবাভোগ। সময় সময় পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা শেয়ালের রূপ ধারণ করে কিম্বা শেয়ালের শরীরে প্রবেশ করে খেয়েদেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করে।

মহান্ত তাঁর কাজ কর্ম সেরে মিঃ রায়কে বলেন, 'আপনি আমার পেছনে বসে পড়ুন। কোন কিছু দেখে ভয় পেলে আমার কোমর ধরে থাকবেন। খবরদার কখ্‌খনো দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না। আর দেখবেন কোন সময় আপনার টর্চ জ্বালবেন না কিন্তু।'

তারপর মহান্ত বসলেন পূজোয়। মিঃ রায় তাঁর পেছনে, ডান-হাতটা আর্মি ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে রিভলভারটা ধরে চুপ করে বসে রইলেন। মাঝে মাঝেই রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ডেকে উঠছিল শেয়ালের দল।

কতক্ষণ পূজো চলে তা আর মিঃ রায়ের খেয়াল থাকেনা। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন সব যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। শেয়ালগুলি আর ডাকছেনা। কি রকম একটা অস্বস্তিকর থমথমে ভাব। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মিঃ রায়ের। তিনি মহান্তর কোমর জড়িয়ে ধরলেন। মহান্ত হাতটা পেছনে নিয়ে তাঁকে স্পর্শ করেন, সাহস দেবার জন্য।

একটু পরেই মিঃ রায় দেখেন যে দুটো রোমশ হাত, এমনিতে মানুষের হাতের মত দেখতে, কিন্তু নখগুলি বড় বড়, জন্তু জানোয়ারদের মত, খপ করে থালার ওপর থেকে কয়েকটা লুচি ও মাংস উঠিয়ে নিয়ে, পেছনে সরে গেল। অন্ধকারে আর কিছু দেখা গেলনা।

কাঠ হয়ে বসে আছেন মিঃ রায় মহান্তকে শক্ত করে ধরে।

আবার হাত দুটো এসে আরও লুচি মাংস থাবা দিয়ে নিয়ে পেছনে উধাও। এইভাবে লুচি, মাংস, পায়েস, জল সব শেষ।

মহান্ত উঠে পড়ে, মিঃ রায়কে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। পথে এ ব্যাপারে মহান্ত যা বললেন তা হচ্ছে মোটামুটি

এই—কিছুদিন ধরে তিনি রাত্রে শ্মশান থেকে যখনই ফিরতেন, এক ছায়ামূর্তি তাঁর পথ আগলে দাঁড়াত। তিনি প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে সে জীবিত অবস্থায় এই অঞ্চলের এক ডাকাত ছিল এবং তার দলের লোকেরাই তাকে খুন করে গুম করে ফেলে। তার অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধ কিছুই হয়নি। তাই সে ক্ষুধা তৃষ্ণায় বড়ই কষ্ট পাচ্ছিল। মহান্ত তাকে আশ্বাস দেন যে তিনি মন্ত্রবলে তাকে সাময়িকভাবে দেহ ধারণ করবার ক্ষমতা দেবেন ও তার ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করবেন।

সময় সময় আত্মা নিজে নিজেই মূর্তি ধারণ করে। মৃত্যুর সময় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আত্মার মূর্তি ধারণ করে প্রিয়জনদের দেখা দেওয়ার বহু ঘটনা আছে। দু একটা বলি।

একজন স্কুল শিক্ষয়িত্রী একদিন ঘুমাতে ঘুমাতে হঠাৎ ভোরের দিকে জেগে যান। তাঁকে জাগিয়ে দিলেন তাঁর বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রমহিলা, যাঁর ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে স্কুলে পড়ত। ঐ ভদ্রমহিলার শীগ্‌গীরই ছেলেমেয়ে হবার কথা ছিল। ভদ্রমহিলা শিক্ষয়িত্রার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বল্লেন যে তিনি মারা গেছেন, তবে বেবী বাঁচবে।

শিক্ষয়িত্রী ভদ্রমহিলার ঘুম পুরোটা ভাঙ্গেনি। একটু পরেই তিনি আবার ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলেন খাটের বাঁ দিকে। আবার সেই একই কথা বলেন ভদ্রমহিলা এবং কথাটা শেষ করেই খাটের পাশ দিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে যান দরজার দিকে।

শিক্ষয়িত্রী ভদ্রমহিলা এবার পুরোপুরি জেগে যান এবং ঐ ভদ্রমহিলাকে কিছু প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখেন যে তিনি ঘরে নেই। শিক্ষয়িত্রী নীচে যান ভদ্রমহিলার খোঁজে, কিন্তু দেখেন যে তিনি কোথাও নেই। তখন তাঁর খেয়াল হল যে তিনি বোধহয় ভুল দেখেছেন।

ওপরে উঠে এসে তিনি তাঁর বোনকে বললেন ঘটনাটা। পরের দিন এক বন্ধুর চিঠিতে তিনি জানতে পারলেন যে ঐ ভদ্রমহিলা বেবী হতে গিয়ে মারা গেছেন এবং বেবী বেঁচে আছে।[১]

১৯৪২ সালে, মিসেস্ ঘোষের স্বর্গীয় ছোটপিসেমশাই স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে ভাগলপুর জেলে ছিলেন। একদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বসে বসে কাগজ পড়ার সময় তিনি হঠাৎ চমকে উঠে দেখলেন যে তাঁর স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন 'আমি এখন যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।' একথা বলেই তিনি মিলিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই ঘড়ি দেখেন ও সময়টা লিখে রাখেন। পিসেমশাইয়ের মনটা খুবই খারাপ হল, ভাবলেন যে তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই খুব বেশী অসুস্থ। সেদিনই তিনি তাঁর ভাইকে তাঁর স্ত্রীর খবরাখবর জানাবার জন্য চিঠি দিলেন। তিনি যা দেখেছেন সেই ব্যাপারটার কথাও তিনি লিখলেন, দিন ক্ষণ সব জানিয়ে।

পিসেমশাই যে দিন যে সময় পিসিমাকে দেখেন ঠিক সেই দিন সেই সময়েই পিসিমা মারা গিয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালে, ডিসেম্বর মাসে, এলাহাবাদে থাকা কালীন মেজর রায় একদিন রাত্রে জৌনপুর থেকে এলাহাবাদ আসছিলেন। রাস্তা একেবারেই ফাঁকা, ড্রাইভার মনের সুখে জীপ চালাচ্ছিল, ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল স্পীডে। হঠাৎ সে জোরে ব্রেক কষে। ভীষণ ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ী থেমে গেল। মেজর রায় আচমকা এই ঝাঁকুনির টাল সামলাতে না পেরে উইণ্ডস্ক্রীনে কপালে বাড়ি খেলেন এবং ছিটকে পড়লেন বাইরে। ভারী ওভারকোট পরা ছিল তাই বিশেষ চোট পাননি।

---

১) Society for Psychical Research Proceedings—Vol. X. Page 214.

উঠে এসে তিনি ড্রাইভারের ওপর খুবই রাগ করলেন শুধু শুধু এরকমভাবে হঠাৎ ব্রেক কষার জন্য।

ড্রাইভার বলে, হঠাৎ কারা যেন গাড়ীর সামনে এসে গিয়েছিল তাই ব্রেক কষা ছাড়া তার উপায় ছিলনা। অথচ রাস্তায় কোন লোক দেখা গেলনা। 'নিশ্চয় তুমি নেশা ভাঙ কিছু করেছো তা না হলে ফাঁকা রাস্তায় লোক দেখবে কেন?' এই বলে শ্রীরায় নিজেই স্টিয়ারিং নিয়ে বসলেন, ড্রাইভার পাশে সরে বসল।

শ্রীরায়েরও গাড়ী জোরে চালান অভ্যাস, তাই যদিও প্রথমে তিনি একটু আস্তে চালাতে শুরু করেছিলেন কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ীর স্পীড ষাট মাইল পেরিয়ে গেল।

হঠাৎ তিনি দেখলেন যে দুজন লোক কোত্থেকে যেন গাড়ীর একদম সামনে এসে হাজির। গাড়ীর আলোয় লোক দুজনকে চিনতেও তিনি পেরেছিলেন—একজন তাঁর ভগ্নীপতি এবং একজন তাঁর এক রকম দাদা হন—রাধুদা। ড্রাইভারের মতই জোরে ব্রেক কষলেন মেজর রায় এবং আগের মতই ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ী থামল। দুজনেই অল্প বিস্তর চোট পেলেন, তবে মারাত্মক কিছু নয়।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে, 'এরা কারা বাবু? আগের বারও আমি ঠিক এই রকম দেখেছিলাম।'

শ্রীরায় বলেন, 'চাঁদনি রাতে অনেক সময় এরকম ভুল দেখা যায়।'

তারপর একটু আস্তেই গাড়ী চালান তিনি, কিন্তু তাঁদের আর দেখতে পাননি।

পরের দিন তিনি তাঁর বাবার কাছে নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং পরে বাবার চিঠিতে জানতে পারলেন যে তাঁর ভগ্নীপতি সেই দিনই সন্ধ্যের সময় হঠাৎ মারা গেছেন। রাধুদা বেঁচে আছেন ও ভাল আছেন। তাঁর বাবা আরও লিখেছেন যে শ্রীরায় নিশ্চয় তাঁর ভগ্নীপতির ছোটভাইকে রাধুদা বলে ভুল

করেছেন, কেননা দুজনের চেহারায় খুবই মিল ছিল। তাঁর ভগ্নীপতির ছোটভাই বছর পাঁচেক আগে ফুটবল খেলতে গিয়ে অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গিয়েছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ অ্যামেরিকা থাকবার সময় শ্রীশ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা, লাটু মহারাজ ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে দেহরক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেয়েছেন এবং পরে জানতে পেরেছেন তাঁদের দেহত্যাগের সংবাদ।" ১

সুশান্ত অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি, এবার বলে, "এই ব্যাপারগুলি হচ্ছে হ্যালিউসিনেশন অর্থাৎ ভুল দেখা। কারো কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মনে হয় যে তাকে দেখলাম বা তার কথা শুনলাম এবং কোন কোন সময় এই দেখাটা হয়ত তার মৃত্যুর সময়ের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়, সেটা হচ্ছে চান্‌স্‌ কো-ইন্‌সিডেন্‌স্‌, অর্থাৎ হঠাৎ মিলে যাওয়া।"

আমি বলি, "যদি কারো জানা থাকে যে কেউ অসুস্থ, তাহলে হয়ত এরকম হ্যালিউসিনেশন দেখা সম্ভব হতে পারে, বিশেষ করে প্রত্যক্ষকারী যদি ঘুম ও জাগার মাঝামাঝি একটা অবস্থায় থাকেন। সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় এরকম হ্যালিউসিনেশন দেখার সম্ভাবনা কম, অসুস্থতার খবর জানা না থাকলে সে সম্ভাবনা আরও কম এবং এই দেখার সময়ের সঙ্গে মৃত্যুর সময় মিলে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। এ ধরনের ঘটনা দু একটা মাত্র ঘটলে তবুও না হয় চান্‌স্‌ কো-ইন্‌সিডেন্‌স্‌ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু এগুলো এত ঘটেছে যে সবগুলোকে চান্‌স্‌ কোইন্‌সিডেন্‌স্‌ বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব।

আর এক ধরনের ঘটনাও খুব সচরাচর ঘটে। সেটা হচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রীর পরলোকগত আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের মূর্তি দেখা। মৃত্যুর আগ দিয়ে, তা কয়েক দিনও হতে পারে বা কিছুক্ষণও হতে পারে, মানুষের শরীর যখন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া যখন কমে যায় তখন অনেকে পরলোকগত প্রিয়জনদের দেখতে পান। এ ধরনের ঘটনা যে কত ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই।

স্বর্গতা কমলা নেহ্রু অসুস্থ হয়ে যখন সুইজারল্যাণ্ড-এ ছিলেন তখন তিনিও এরকম দেখতে পেতেন। এ সম্বন্ধে স্বর্গত জওহরলাল নেহ্রু 'ডিস্কাভারি অভ্ ইণ্ডিয়া'তে যা লিখেছেন পড়ে শোনাই, 'As these last days went by a subtle change seemed to come over Kamala. The physical condition was much the same, so far as we could see, but her mind appeared to pay less attention to her physical environment. She would tell me that someone was calling her, or that she saw some figures or shape enter the room when I saw none.' [১]

(শেষের দিনগুলি যখন কাটছিল তখন মনে হত কমলার যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছে। আমরা যত দূর দেখতে পেতাম, শারীরিক অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল, কিন্তু মনে হত যে বাস্তব পরিবেশের ওপর তাঁর মনোযোগ কমে গিয়েছে। তিনি আমাকে বলতেন যে কেউ তাঁকে ডাকছে, কিম্বা তিনি কিছু কিছু মূর্তি ঘরে ঢুকতে দেখেছেন অথচ আমি কাউকে দেখতে পেতাম না।)

১) 'The Discovery of India'—Jawaharlal Nehru. Publisher, Sri.Dilip Kumar Gupta, The Signet Press. 1946. Page 38.

এবার আপনা আপনি যে সব ভৌতিক ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে কিছু বলি। সচরাচর যে ভৌতিক ঘটনাগুলি ঘটে সেগুলি হচ্ছে পোল্টারগাইস্ট হন্টিং। পোল্টারগাইস্ট একটা জার্মান শব্দ, যার মানে হচ্ছে দুরন্ত আত্মা বা ভূত। সাধারণ ভূত, বিশেষ কোন জায়গায় বা বাড়ীতে অধিষ্ঠান করে। কিন্তু দুরন্ত ভূতের উৎপাত বিশেষ বিশেষ মানুষকে কেন্দ্র করে—সাধারণত বারোর থেকে বিশ পর্যন্ত বয়সের মেয়ে কি ছেলে।

দুরন্ত ভূত যে বাড়ীতে কত রকম উৎপাত করতে পারে তার ইয়ত্তা নেই—পায়ের আওয়াজ করা, দরজা ধাক্কানো, বেল বাজানো, জানালা দরজা খোলা ও বন্ধ করা, ফার্নিচার সরানো, জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলা, কাচের বাসন ভাঙ্গা, ঢিল ছোড়া, জানালার কাচ ভাঙ্গা, আলো জ্বালা বা নিভিয়ে দেওয়া, জল ছেটানো, বিছানার চাদর ছিনিয়ে নেওয়া, চুলধরে টানা, চিমটি কাটা, চড় মারা, বন্ধ-আলমারির ভেতরে কাপড়জামা তছ্‌নছ্‌ করা, ছিঁড়ে ফেলা, আগুন লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

পৃথিবীর বোধহয় এমন কোন দেশ নেই যেখানে এরকম ভুতুড়ে উৎপাত ঘটেনি। ঢিল ছোড়ার ব্যাপারটা ত' প্রায়ই ঘটে। এর অনেক ঘটনাই ঠিকভাবে তদন্ত হয়নি, অনেক ঘটনায় ব্যাপারগুলির সঙ্গে ভূতের কোন সম্পর্কই নেই, মানুষেই করেছে, আবার অনেক ঘটনা উপযুক্ত তদন্তকারী ও পুলিশ ভালভাবে পরীক্ষা করেও কোন কারণ বের করতে পারেনি। কয়েক সময় বাড়ীতে পড়া ঢিল, চিহ্ন দিয়ে কাছাকাছি পুকুর কিম্বা নদীতে ছুড়ে ফেলার পরেও সেগুলো আবার উঠে এসে বাড়ীতে পড়তে দেখা গেছে।

এই ভুতুড়ে উৎপাতের সঙ্গে মিডিয়াম অবস্থার বাস্তবিক ঘটনাবলীর সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। শুধু যে ঘটনাগুলির মিল তা নয়; মিডিয়াম অবস্থার বাস্তবিক ঘটনাবলী যেমন একজন মিডিয়ামের উপস্থিতিতে ঘটে তেমনি এই ব্যাপারগুলিও সাধারণত

একজন অল্পবয়সের মেয়ে কি ছেলের উপস্থিতিতে ঘটে, যে অনিচ্ছাকৃত ও অজানিত ভাবে একজন মিডিয়াম হিসাবে কাজ করে।

অনেক সময় দেখা গেছে যে কোন বাড়ীতে এই ধরনের উৎপাত শুরু হবার পর, যে ছেলে কি মেয়েকে কেন্দ্র করে ব্যাপারটা হয়, তাকে যদি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই অন্য জায়গায়ও আবার উৎপাত শুরু হয়।

এ ধরনের ঘটনা মাঝে মাঝে কাগজে দেখে থাকবে। আমি শুধু একটা ঘটনার কথা বলি।

এলিনোর জুগুন নামে একটি চোদ্দ বছরের রুমানিয়ার মেয়েকে ঘিরে এই উৎপাত শুরু হয়। এক ভদ্রমহিলা তাকে বিলেতে নিয়ে আসেন এবং লণ্ডনের ন্যাশনাল্ ল্যাবরেটরী অভ্ সাইকিক্যাল রিসার্চ-এর সভ্যেরা তাকে পরীক্ষা করার বন্দোবস্ত করেন। যোগ্যতাসম্পন্ন তদন্তকারীরা যাদের মধ্যে হ্যারি প্রাইস্ও ছিলেন, দিনের আলোয় তাকে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার সময় সিলিং-এর থেকে একটু নীচে, দেওয়ালের তাকে রাখা টাকা পয়সা, আপনা থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ড্রয়ারে রাখা চিহ্ন দেওয়া টাকা পয়সা তদন্তকারীদের পকেট থেকে বের হয়। মাঝে মাঝে এলিনোর চীৎকার করে ওঠে এবং তার গায় দেখা যায় দাঁত বসানোর দাগ—কেউ যেন কামড়ে দিয়েছে তাকে। তদন্তকারীরা তার দিকে সব সময় কড়া নজর রাখছিলেন, অতএব তার নিজের পক্ষে এসব করার কোন উপায় ছিলনা।[১]

---

১) The National Laboratory of Psychical Research Proceedings, January 1927. ('Guide to Modern Thought'—C. E. M. Joad. Pan Books Ltd, publisher, 1943. Page 217-218).

এবার সাধারণ ভূতের কথা বলি যাদের বিশেষ বিশেষ স্থানে বারে বারে দেখা যায়। কোন সময় হয়ত একসঙ্গে অনেক লোকেই এদের দেখতে পায়, অনেক সময় আবার অনেক লোকের মধ্যে কেউ কেউ দেখতে পায়। সময় সময় জন্তু জানোয়ারের বিশেষ করে কুকুরের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে তারাও এদের দেখতে পায় কিম্বা এদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে।

এ রকম একটা ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এক ভদ্রমহিলা, মিস্ মর্টন এই ছদ্ম নামে এবং সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির প্রসীডিং-এ 'রেকর্ড অভ্ এ হন্টেড হাউস' নাম দিয়ে এটা প্রকাশিত হয়েছে।

মিস্ মর্টন লিখেছেন যে ১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে, তিনি তাঁর বাবা, মা, এক ভাই ও তিন বোনের সঙ্গে একটা নতুন বাড়ীতে উঠে আসেন। এই বাড়ীতে আসার ছু বছরের মধ্যে তিনি ছ-সাত বার এক ভদ্রমহিলার প্রেত মূর্তি দেখতে পান। ভদ্রমহিলার পরনে কালো উলের পোশাক, মুখটা ডান হাতের রুমালে ঢাকা শুধু বাঁ দিকের কপাল ও খানিকটা চুল দেখা যায়, মাথায় বনেট, হাত ছুটো পুরো হাতার জামায় ঢাকা এবং কব্জিতে বিধবারা যেমন পরেন সেরকম ব্যাণ্ড।

এই মূর্তি তিনি প্রথম দেখতে পান এ বাড়ীতে আসার মাস ছুই পরে। একদিন রাত্রিবেলা ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুতে যাবেন এমন সময় দরজার কাছে কে যেন এসেছে এ রকম আওয়াজ পেলেন এবং হয়ত মা এই ভেবে দরজার কাছে গেলেন। কিন্তু দরজা খুলে দেখেন যে কেউ নেই। তখন প্যাসেজ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পান ঐ ভদ্রমহিলার মূর্তি, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই মূর্তিটা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল এবং মিস্ মর্টনও চললেন পেছন পেছন, ওটা কি তাই ভাবতে ভাবতে। মিস্ মর্টনের হাতে ছিল ছোট্ট একটা মোমবাতি, হঠাৎ

সেটা নিবে গেল। অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেয়ে তিনি ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

১৮৮৪ সালের উনত্রিশে জানুয়ারী, মিস্ মর্টন ঐ মূর্তির সঙ্গে প্রথম আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?'

মূর্তিটা নড়ে চড়ে উঠল। মিস্ মর্টন ভাবলেন কথা বলবে। কিন্তু শুধু একটা হাঁপানির মত আওয়াজ হল এবং মূর্তিটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে মিস্ মর্টন আবার কথা বললেন, কিন্তু জবাব পেলেন না। তাঁর মনে হল সে কথা বলতে অক্ষম। তারপর বরাবরের মত হলঘর দিয়ে গিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

ঐ মূর্তিকে ধরবার চেষ্টাও করেছেন মিস্ মর্টন, কিন্তু প্রত্যেক-বারই আলগোছে সরে গেছে সেটা, এবং যখনই কোণঠাসা হয়েছে তখনই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মিস্ মর্টনের বিবাহিতা বোনও দেখেছেন ঐ মূর্তি কয়েকবার একা, একবার মিস্ মর্টনের সঙ্গে। আবার এমনও হয়েছে যে একই সময়ে একই ঘরে মিস্ মর্টন দেখতে পেয়েছেন ঐ মূর্তি কিন্তু তাঁর বোন পান নি।

১৮৮৩ সালে, ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি, মিস্ মর্টনের ছোট ভাই ও আর একটি ছেলে বাইরে খেলতে খেলতে হঠাৎ দেখতে পায়, যে বসবার ঘরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রমহিলা করুণ ভাবে কাঁদছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে আসে ঘরে, কিন্তু সেই ভদ্রমহিলাকে আর দেখতে পায় না। ঝি বলল, ঘরে কেউ আসে নি।

১৮৮৪ সালের ২১শে জুলাই, রাত প্রায় ন'টার সময়, মিস্ মর্টন বসবার ঘরে জানালার কাছে একটা সোফায় বসে বই পড়ছিলেন। ঘরে তাঁর বাবা ও বোনেরাও বসেছিলেন। একটু পরেই সেই মূর্তি

মিস্ মর্টনের সোফার পেছনে খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। আর কেউ তাকে দেখতে পেলেন না, এই ভেবে মিস্ মর্টন খুব অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর ছোট ভাই, যে আগে একবার ঐ মূর্তি দেখেছিল, সে ঘরে ছিল না। প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল ঐ মূর্তি তারপর হলঘর দিয়ে বাগানের দরজার কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল। মিস্ মর্টন তার পেছন পেছন গিয়েছিলেন এবং কথাও বলেছিলেন এবং মূর্তিটা আগের বারের মতই কথা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু পারলনা।

বাড়ীর ঝিরা এবং মিস্ মর্টনের অন্য বোনেরাও দুজন সময় সময়ে দেখতে পেয়েছে মূর্তিটা, কিন্তু তাঁর বাবা মা কোন দিনই দেখেন নি।

প্রথম দিকে বাড়ীর কাউকে ঘটনাটা বলেন নি মিস্ মর্টন, কিন্তু পরে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। একদিন তাঁরা সকলে মিলে অপেক্ষা করছিলেন মূর্তিটা দেখবার জন্য কিন্তু সেদিন কেউই দেখতে পাননি।

পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন অনেকেই, এমনকি বাইরের লোকেরাও। সবশুদ্ধ অন্তত বিশজন লোক পায়ের আওয়াজ ও অন্য আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন।

ফটো তোলার চেষ্টাও করেছিলেন মিস্ মর্টন, ফ্রেড্‌রিক মায়ার্স-এর পরামর্শ মত, কিন্তু মোমবাতির আলোয় ফটো তুলতে ত' অনেক সময় লাগে তাই ফটো ওঠেনি।

১৮৮৭ সাল থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত মূর্তিটা খুব কমই দেখা গেছে, কিন্তু পায়ের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যেত। ১৮৮৯ সালের পরে মূর্তিটাকে আর দেখাই যায়নি, অবশ্য পায়ের আওয়াজ কিছুদিন শোনা গিয়েছিল। ১৮৯২ সাল থেকে পায়ের আওয়াজও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মূর্তিটাও শেষের দিকে আবছা হয়ে গিয়েছিল, ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত সেটা জীবন্ত মানুষের মতই দেখাত।[১]

১) Society for Psychical Research Proceedings—Vol. VIII. Page 311-332.

এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।[১]

এ ধরনের একটা ঘটনা দেখেছেন কলকাতার খ্যাতনামা সার্জন্, ডাক্তার নৃপেন দাস।

১৯৩৯ সালে, ডাক্তার দাস, বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট হস্পিটালে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন্ ছিলেন। হাসপাতাল প্রাঙ্গনে ছিল তাঁর কোয়ার্টার্স্। তাঁর কোয়ার্টার্স্-এর কাছেই ছিল মেইল্ ও ফীমেইল্ পেয়িং ওয়ার্ড। কিন্তু মাঝে কলেরা ওয়ার্ড থাকায় তাঁর কোয়ার্টার্স্ থেকে সোজাসুজি পেয়িং ওয়ার্ডে যাওয়া যেতনা, বেশ খানিকটা ঘুরে ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডের সামনে দিয়ে যেতে হত। ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডের ছিল আলাদা কম্পাউণ্ড ওয়াল ও গেট। গেটের সোজাসুজি ছিল লেবার রুম্। সেখানে সারারাত জ্বালানো থাকত বড় বড় কয়েকটা আলো এবং কাচের জানালা দিয়ে আলো এসে ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডের প্রায় পুরো কম্পাউণ্ডই আলোকিত করে রাখত।

ডাক্তার দাসকে মাঝে মঝেই বেশী রাত্রে হাসপাতালে রোগী দেখতে যেতে হত। প্রথম দিন বেশী রাত্রে পেয়িং ওয়ার্ডে যাবার সময় তিনি লেবার রুমের সামনে থান ধুতি পরা এক বিধবা মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তার কোলে ছিল একটি বছর দেড়েকের ছেলে। ডাক্তার দাস ভাবলেন, ছেলেমেয়ে হতে এসেছে এমন কারো আত্মীয়া হবে। এর দু-তিন দিন পরে যখন তিনি আবার বেশী রাত করে পেয়িং ওয়ার্ডে যান তখনও তিনি ঐ মহিলাটিকে ছেলে কোলে নিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন।

এই ভাবে প্রায় চোদ্দ পনের বার মহিলাটিকে একই জায়গায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার পর একদিন রাত্রে ডাক্তার দাসের হঠাৎ খেয়াল হল যে এটা কি করে সম্ভব হয়। একই মহিলা রাতের পর রাত কেন লেবার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে? তখন

তিনি ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডের গেট দিয়ে ঢুকে দরোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মৌলবী, এই মেয়েলোকটি কে? যে রাতের পর রাত লেবার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।'

'ও এখানেই থাকে বাবু, কারো কোন অনিষ্ট করেনা।' এই বলতে বলতে মৌলবী গেট সংলগ্ন কুঠরীর থেকে বেরিয়ে এলো।

ডাক্তার দাস মৌলবীকে সঙ্গে আসতে বলে ঐ মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। মহিলাটি ডান দিকে লেডি ডাক্তারের কোয়ার্টার্স্-এর দিকে সরে গেল। ডাক্তার দাস মৌলবীকে নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করলেন। মহিলাটি তখন লেডি ডাক্তারের একতলা বাড়ীর ছাদে উঠে গেল এবং ধীরে ধীরে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

এই ঘটনার পর আর কোনদিন বেশী রাত্রে ডাক্তার দাস ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে একা যান নি, সঙ্গে লোক রাখতেন। কিন্তু ঐ মহিলাটিকে তিনি আর দেখতে পাননি।

আরও একটা ঘটনা শোনো—সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির প্রসীডিংস্ থেকে।

১৮৮৬ সালের ১৩ই মার্চ, এক ভদ্রমহিলা রাত এগারোটা এরকম সময় শুতে যান। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে আসে, কে যেন কাঁদছে গভীর দুঃখে। চমকে উঠে পড়লেন তিনি এবং ঘরের আলো বাড়িয়ে দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জানালার খড়খড়ি সরিয়ে তাকিয়ে দেখেন যে মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন সেনাপতির পোশাকে এক সৈনিক এবং তাঁর সামনে খুবই সুন্দরী একটি মেয়ে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে হাত জোড় করে কাঁদছে। কিন্তু ঐ সেনাপতি হাত দেখিয়ে তাকে চলে যেতে বলছেন।

এই দেখে মেয়েটির জন্য খুবই কষ্ট হয় ভদ্রমহিলার। সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে যান তিনি এবং বাইরের দরজা খুলে

মেয়েটিকে ভেতরে এসে তার দুঃখের কথা জানাতে বলেন। কিন্তু তারপরেই লক্ষ্য করে দেখেন যে মূর্তি দুটো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

ভদ্রমহিলার স্বামী সেদিন বাড়ী ছিলেন না। পরে তাঁর কাছে তিনি জানতে পারেন যে এই বাড়ীতে আগে যারা ছিলেন তাঁদের পরিবারে বহুদিন আগে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঐ পরিবারের ছোট মেয়েটির একটা দুষ্কার্যের জন্য মা বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন তাকে পরিত্যাগ করেন এবং মেয়েটি শেষ-মেষ মারা যায়। এই পরিবারের একজন নিকট আত্মীয় ছিলেন ওই সেনাপতি, যাঁর সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার স্বামীরও কিছু আত্মীয়তা ছিল। ঘটনাটা বহু পুরানো বলে ভদ্রমহিলার স্বামী আগে এ বিষয়ে তাঁকে কিছু বলেন নি।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে এক বাড়ীতে যান। সেখানে দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবি দেখে তিনি চীৎকার করে ওঠেন—'আরে দেখ, ঐ ত' সেই সেনাপতি!'

ছবিটা সেই সেনাপতিরই ছিল। ছবিটা দেখলে ভদ্রমহিলা কি করেন সেটা দেখবার জন্যই তাঁর স্বামী তাঁকে কিছু না বলে সেনাপতির ভাগ্নের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১]

"আমার ছোট বোন ডালুকে ত' তোমার মনে আছে, গৌহাটিতে দেখেছিলে। ওর বর সুধেন্দু, কেমিক্যাল এনজিনীয়ার, একটা ব্রিটিশ কোম্পানীতে চাকরি করে, কলকাতায় একটা ফ্যাক্‌ট্রির ম্যানেজার। ওর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

১৯৩৭ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে, একটা কাজে, সুধেন্দু একদিন রাত্রিবেলা মিঃ বোসের চেম্বারে যায়। এর আগেও কয়েকদিন

১) Society for Psychical Research Proceedings—Vol. VIII. Page 178.

গেছে। মিঃ বোস একজন অরথপেডিস্ট, কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি তৈরী করেন, কলকাতায় বেশ নাম করেছেন।

রাত্রি তখন দশটা হবে। মিঃ বোস তাঁর কামারশালে কাজ করছিলেন। সুধেন্দু প্যাসেজের ওপর কামারশালের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাজ দেখছিল। ঐ প্যাসেজের পরেই মিঃ বোসের চেম্বার, আলমারি দিয়ে পার্টিশ্যান করা। প্রথম আলমারিটা দেওয়াল থেকে একটু সরিয়ে রাখা, সেখান দিয়েই চেম্বার থেকে প্যাসেজে এবং প্যাসেজ থেকে কামারশালায় যাতায়াতের পথ।

কাজ দেখতে দেখতে হঠাৎ একবার চেম্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুধেন্দু দেখে, যে একটি মেয়ে আলমারির আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ বের করে উঁকি দিয়ে দেখছে। ও তখন মিঃ বোসকে বলে 'আপনাকে কে যেন ডাকছেন।'

মিঃ বোস ত' অবাক, কেননা সুধেন্দু আসবার পরেই তিনি বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই ফ্ল্যাটে একটাই মাত্র দরজা—রাস্তার দিকে। তিনি কাজ ফেলে উঠে এসে দেখেন, দরজা বন্ধই রয়েছে এবং সুধেন্দুকে বলেন, 'দরজা যখন বন্ধ তখন কারো ত' আসবার উপায় নেই।'

সুধেন্দু বলে, 'তা কি করে হয়? আমি পরিষ্কার দেখলাম যে একটি মেয়ে আলমারির পাশ দিয়ে মুখ বের করে উঁকি দিচ্ছে।'

মিঃ বোস তখন সুধেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে পুরো ফ্ল্যাট খুঁজে দেখলেন —কেউ কোথাও নেই। সুধেন্দু ত' তাজ্জব।

তখন মিঃ বোস বলেন 'এঁরা সব এরকম মাঝে মাঝে আসেন, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই।'

সুধেন্দুর কাছে ঘটনাটা শুনে আমি মিঃ বোসের সঙ্গে দেখা করি। তিনি এ সম্পর্কে যা বলেন তা হচ্ছে এই।

১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে, তিনি এই বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন নিজের ও বাবার চেম্বারের জন্য। তাঁর বাবা ডাক্তার। তিনতলা

বাড়ীর নীচের তলায় একটা বড় হলঘর ভাড়া নিয়ে পার্টিশ্যান দিয়ে ঠিকঠাক করে নিয়েছেন মিঃ বোস। নীচের তলায় আরও কয়েকটা অফিস আছে। দোতলা তিনতলায় মালিকেরা থাকেন।

এ বাড়ীতে আসার প্রথম দিনেই পাড়ার ছেলেরা তাঁকে বলে, 'এলেন ত' এ বাড়ীতে কিন্তু থাকতে পারবেন না। অনেকবার এই ফ্ল্যাট ভাড়া হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারেই ভাড়াটেরা অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিদায় হয়েছে। ছ'মাসের ওপর এটা খালি পড়েছিল, আজ আপনারা এলেন। বাড়ীটা নেবার আগে আপনি যদি একবার আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন।'

মিঃ বোস শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন? বাড়ীওয়ালা কি উৎপাত করে......'

'না, না, বাড়ীওয়ালার উৎপাত নয়' ছেলেরা বাধা দিয়ে বলে, 'তার থেকে অনেক গুরুতর, ভূতের উৎপাত।'

ছেলেরা জানায়, যে তিনি যে হলঘরটা ভাড়া নিয়েছেন সেটা ছিল আগে জমিদারবাবুদের বৈঠকখানা। ওখানে বাইজীদের নাচ গান হত। তারা আরও বলে, যে ঐ ঘরে জমিদারবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয় একটি ছেলে এবং একটি বাইজীর মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল!

মিঃ বোস ভাবেন যে বাড়ীর পেছনে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করবার উপায় নেই, তাছাড়া রাত্রিবাস ত' আর করতে হবেনা এখানে।

প্রথম প্রথম কোন গণ্ডগোলই হয়নি। রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই তিনি চেম্বার বন্ধ করে চলে যেতেন। একদিন একটা জরুরী কাজে রাত হয়ে যায়। বাইরের লোকজন ত' ছিলইনা—অ্যাসিস্ট্যাণ্টও চলে গিয়েছিল। মিঃ বোস তাঁর কাজের ঘরে বসে, এক স্কলিওটিক্ রোগীর জন্য ব্রেইস্ তৈরী করছিলেন এবং

কাজ করতে করতে গান গাইছিলেন। রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা।

হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁর গানের প্রতিধ্বনি হচ্ছে, এবং একটু খেয়াল করে বুঝতে পারলেন যে প্রতিধ্বনি নয়, কে যেন তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গাইছে—একটি মেয়ের গলা। এর আগেও ত' তিনি কত গান করেছেন, কিন্তু এরকম ত' হয়নি কোনদিন—অবাক হয়ে গান বন্ধ করে দেন তিনি। কেউ কি এসেছে এখানে এই ভেবে চারদিক খুঁজে দেখেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পাননা। গাটা ছমছম করে ওঠে মিঃ বোসের। চেম্বার বন্ধ করে চলে যান তিনি সেদিনের মত।

কিন্তু এর পরেও বহুদিন বেশী রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে এবং মাঝে মাঝে তিনি তাঁর গানের মধ্যে অন্য লোকের গলা শুনতে পেয়েছেন। কোন দিন একটি মেয়ের গলা, কোন দিন একটি মেয়ে ও একটি ছেলের গলা, একই সঙ্গে।

আলমারির ফাঁক দিয়ে, একটি মেয়েকে দেখতেও পেয়েছেন তিনি কয়েক দিন—সতেরো কি আঠারো বছর বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে, ঘাগরা পরা। এই মেয়েটিই নিশ্চয় গান করে, ভাবেন মিঃ বোস, বোধহয় এই সেই বাইজীর মেয়ে, যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল এই ঘরে।

একটি ছেলেকেও দেখেছেন তিনি মাঝে মাঝে, ধুতি পাঞ্জাবী পরা—খুব সম্ভব জমিদার বাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছেলেটি। সেও আত্মহত্যা করেছিল এই ঘরে। সাদা কাপড় পরা এক ভদ্র-মহিলাকেও দেখেছেন মিঃ বোস।

তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং বাইরের লোকেরাও কিছু কিছু দেখেছেন। একটি তেরো চোদ্দ বছরের ছেলেও একদিন ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কি যেন দেখে।

আজকাল বেশী রাত পর্যন্ত কাজ করেন না মিঃ বোস। ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে তিনি শেষ দেখেছেন ঐ ঘাগরা পরা মেয়েটিকে এবং ছেলেটি ও মেয়েটির গলা শুনেছেন।

মেজর রায়ের জীবনের অভিজ্ঞতার তিনটে ঘটনা তোমায় আগে বলেছি, এবার আর একটা শোন। এটা অবশ্য ঠিক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা নয়, তিনি ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলেন।

১৯৬৮ সালের শীতকাল। মেজর রায় তখন বহরমপুরে ছিলেন। ব্রিটিশ আমলের পুরানো জেল এলাকায়, জেল শাসকের কোয়ার্টার্স্‌-এ তিনি থাকতেন। বিরাট এই জেলের প্রায় পঞ্চাশ বিঘা কমপাউণ্ড, পঁচিশ ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় শত শত বন্দীদের এখানে রাখা হয়েছে গাদাগাদি করে, তাদের ওপর করা হয়েছে অকথ্য অত্যাচর এবং কাউকে কাউকে দেওয়া হয়েছে ফাঁসি এখানকারই ফাঁসিমঞ্চে। মিঃ রায়ের কোয়ার্টার্স্‌-এর প্রায় একশ' ফুট দূরেই হচ্ছে জেল-ব্যারাক।

সেই বছরই শীতকালে, ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মাসে, দমকল-বাহিনীর প্রায় চল্লিশজন কর্মচারী এবং তুজন অফিসারকে এই জেল-ব্যারাকে থাকতে দেওয়া হয়। কর্মচারীরা সবাই প্রায় ছেলে ছোকরা, কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস। তারা থাকত বিরাট একটা হলে, আর অফিসাররা থাকতেন অন্য একটা ঘরে।

তু-চার দিন যেতে না যেতেই এই কর্মচারীরা বলতে লাগলেন যে জায়গাটা সুবিধের নয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্রিবেলা এদিক ওদিক এমন সব লোকজন দেখেছেন যাঁদের সাধারণ লোক বলে মনে হয়নি। দমকলবাহিনীর অফিসার তুজন শ্রীরায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপও করেছেন।

এর তু-তিন দিন পরেই একদিন গভীর রাত্রে ভীষণ চেঁচামেচি শুনে শ্রীরায়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ওভারকোট

চাপিয়ে বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে এসেই তিনি দেখেন যে দমকল বাহিনীর ছেলেরা সব পড়ি কি মরি করে ছুটছে। তিনি যত বলেন 'কি হয়েছে? ছুট্‌ছো কেন? দাঁড়াও', কে কার কথা শোনে, সব পালাতে ব্যস্ত। সবাই প্রায় চলে গেল। শেষের একজনের তিনি হাত ধরে ফেললেন। সে ত' পড়েই গেল ধপাস্ করে। তারপর উঠে বলে, 'ছেড়ে দিন স্যার, ছেড়ে দিন, এখানে আর থাকবোনা, এ ভীষণ জায়গা।' ভাল করে কথা বলতে পারে না ছেলেটি।

শ্রীরায় ফিরে গেলেন তাঁর কোয়ার্টার্স্‌-এ। ছেলেরাও গিয়ে জড়ো হল তার কাছাকাছি এক জায়গায়। একটু পরেই দমকল-বাহিনীর অফিসার দুজন এলেন মিঃ রায়ের কাছে। তাঁরা জানালেন যে তাঁদের লোকজনেরা কি যেন সব দেখেছে তাদের ঘরে। তারা আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে রাজী নয়। তারা বলছে এক্ষুণি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবে—তাদের অন্যত্র থাকার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য। অফিসার দুজন বড়ই বিব্রত বোধ করছিলেন।

ব্যাপারটা কি তা পরিষ্কারভাবে বুঝবার জন্য মেজর রায় ঐ ছেলেদের এক একজন করে ডেকে আনতে বললেন। তাদের কথার থেকে যা বোঝা গেল তা হচ্ছে মোটামুটি এই—মাঝরাত্রে একটি ছেলের বাথরুমে যাবার দরকার হয়। সে তখন তার পাশের ছেলেটিকে ডেকে উঠায়। বাথরুমটা বাইরের দিকে, তাই একা একা যেতে তার সাহস হয়না। ঘরে দু-তিনটে লণ্ঠন জ্বালানো ছিল। গায় র‍্যাপার জড়িয়ে, চটি পরে তৈরী হচ্ছে এমন সময় তারা ঘরের অন্য প্রান্তে একটা আওয়াজ শুনতে পায়। তাকিয়ে দেখে যে দুজন লোক পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমে তারা মনে করে যে তাদের দলেরই লোক। একটু কাছে আসতেই দেখে, যে দুজন লোকই মুণ্ডহীন, ঘাড় কাটা।

এই দেখে তারা বিকট চীৎকার দিয়ে ছুট্ দিল। তাদের চীৎকারে অন্য সকলেরও ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং এই বীভৎস দৃশ্য দেখে তারা যেভাবে ছিল সেই ভাবে চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই যে এই দৃশ্য দেখেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না, তবে বেশীর ভাগ ছেলেই দেখেছিল।

রাত্রিবেলা কিছুতেই তাদের আর ব্যারাকে পাঠানো গেল না। সকাল বেলা শ্রীরায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোন করে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন এবং তিনি তাদের অন্যত্র থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

মিস্ এক্স্-এর অভিজ্ঞতার থেকে একটা ঘটনা বলি। মনে আছে ত' মিস্ এক্স্ কে, যার অ্যাস্ট্রাল ট্রাভ্ল্ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরে ভ্রমণের কথা, ঐ যে রেলের টিকেট খুঁজে পাবার ব্যাপারটা বলেছিলাম।"

সুশান্ত হেসে জবাব দেয়, "মনে থাকবে না আবার? এক্স্, ওয়াই, জেড্ করে করে আমার মাথাটা একেবারে গুলিয়ে দিয়েছিলে।"

"উপায় নেই ভাই, ভদ্রমহিলা কিছুতেই নাম বলতে দেবেন না। তবে এবার ওয়াই, জেড্ নেই, শুধু এক্স্।

মিস্ এক্স্ তখন দিল্লীতে কাজ করতেন, একটা নাম করা স্কুলে পড়াতেন। ১৯৪৭ সালে, কার্জন পার্কের একটা মিলিটারি ব্যারাকের দোতলাটাকে সাময়িকভাবে ঐ স্কুলের টিচারদের হস্টেল-এ পরিণত করা হয়। লম্বা করিডর, তার দুপাশে ছোট ছোট ঘর, এক একদিকে পঁচিশটা করে। আগে একটা করে ঘরই ছিল, সেখানে মাথা পর্যন্ত উঁচু কাঠের পার্টিশ্যান দিয়ে ছোট ছোট ঘর

করা হয়েছে। এই ঘরগুলির শেষে রয়েছে বেশ বড় একটা হল যেটা খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত, তারপর রান্নাঘর এবং একদম শেষে বাথরুম ব্লক—যার এক এক পাশে ষোলটা করে বাথরুম। বড় হলটার পাশে কারো থাকবার ইচ্ছা ছিলনা কিন্তু মিস্ এক্স্ দেরী করে হস্টেলে আসায় তারই একটা ঘর তাঁর ভাগে জুটলো। অন্যটা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ইউ. পি.র এক ভদ্রমহিলা। সিঁড়ির মুখে ছিল একটা গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক্।

এ বাড়ীতে আসবার দু-একদিন যেতে না যেতেই টিচাররা লক্ষ্য করলেন যে এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। মাঝ রাত্রে ঠিক বারোটার ঘণ্টা পড়বার পরেই একটা খট্‌খট্ করে আওয়াজ হয়। আওয়াজটা শুরু হয় ঠিক সিঁড়ির মুখের কাছে, তারপর খট্···খট্··· খট্ করতে করতে করিডর দিয়ে এগিয়ে যায় খাবার ঘরের দিকে, সেখান থেকে রান্নাঘর, রান্নাঘর পেরিয়ে বাথরুম, তারপর মিলিয়ে যায় সেটা। আওয়াজটা যে কিসের তা সঠিক করে কেউ বলতে পারেন না। কেউ বলেন, ভারী জুতোর আওয়াজ, কেউ বলেন লোহার নাল বাঁধানো বুটের আওয়াজ, আবার কেউ বলেন লাঠির আওয়াজ।

এটা কি ব্যাপার সে বিষয়ে সবাই দরোয়ানকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু দরোয়ান বলে, যে সে কিছুই জানেনা, এখানে ত' বাইরের লোক ঢুকতে পারার কোন সম্ভাবনা নেই, এরকম আওয়াজও সে কোনদিন শোনেনি ইত্যাদি।

একদিন এই আওয়াজটা শুনবার পর মিস্ এক্স্-এর হঠাৎ রোখ চাপলো যে তিনি বেরিয়ে গিয়ে দেখবেন, ব্যাপারটা কি? ড্রেসিং গাউন পরে, চটি পায়ে দিয়ে, দরজা খুলে তিনি বের হতে হতে আওয়াজটা খাবার ঘর পার হয়ে চলে গেল। অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না, শুধু আওয়াজটা কানে আসতে লাগল খট্···খট্···খট্···খট্। গাটা ছম ছম করে ওঠে মিস্ এক্স্-এর,

কিন্তু তবুও তিনি এগিয়ে চলেন আওয়াজ লক্ষ্য করে। রান্নাঘর পার হয়ে আওয়াজটা বাথরুম ব্লকের ভেতর ঢুকে পড়ল। মিস্ এক্স্‌ও এগিয়ে গেলেন কিন্তু বাথরুম ব্লকে ঢুকতে আর সাহস হলনা। বুকের মধ্যে তখন তাঁর কে যেন হাতুড়ি পিটছে। এই ব্লকের সামনেই ছিল অনেকগুলো লাইটের সুইচ। দুহাতে যে কটা পারেন সুইচ টিপে দিলেন তিনি।

খট্ খট্ আওয়াজ শুনে আরও কয়েকজন টিচারের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, আলো জ্বলতে দেখে তাঁরা উঠে পড়লেন এবং হাঁকডাক করে আর সবাইকেও উঠিয়ে দিলেন। সবাই বেরিয়ে গিয়ে, বাথরুম ব্লকের সামনে মিস্ এক্স্‌কে দেখতে পেয়ে তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলেন। এই দুঃসাহসের জন্য কিছু জ্ঞান বাক্যও শুনতে হল তাঁর।

পরের দিন, এক ফাঁকে মিস্ এক্স্ একা একা দরোয়ানের কাছে গিয়ে তাকে চেপে ধরলেন, ব্যাপারটা কি তা বলবার জন্য। সে ত' প্রথমে কিছুই বলেনা, পরে আমতা আমতা করে বলে, যে খবরটা জানাজানি হলে তার চাকরি যাবে। আর কাউকে তিনি বলবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করে মিস্ এক্স্ অনেক কষ্টে দরোয়ানের কাছ থেকে এই রহস্য উদ্ঘাটন করলেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

মণিপুর ফ্রণ্টে, যুদ্ধের পর একদল অ্যামেরিকান সৈন্য দিল্লীতে এসে এই ব্যারাকটায় ছিল, সকলেরই বয়স অল্প। তাদের মধ্যে একটি ছেলের একটা পা হাঁটুর নীচ থেকে কাটা ছিল। যুদ্ধে আহত হওয়ার জন্য তার পা কেটে ফেলতে হয়। সে কাঠের পা লাগিয়ে হাঁটত। একদিন সকালে দেখা গেল যে বাথরুমে গলায় দড়ি দিয়ে ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে। তার কাগজপত্রের থেকে পরে জানা গেল যে, ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালবাসত এবং তার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে যুদ্ধে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসতে হয়, তাই বিয়ে হয়নি। দিল্লী এসে ছেলেটি তার পা কেটে ফেলার খবর জানিয়ে মেয়েটিকে চিঠি দেয়। মেয়েটি

জবাবে জানায় যে এই অবস্থায় তার পক্ষে ছেলেটিকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। যে দিন চিঠি পায় সেদিন রাত্রেই ছেলেটি বাথরুমে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

আমি মিস্ এক্স্‌কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তারা দল বেঁধে একদিন ঘরে আলো জ্বালিয়ে রেখে দেখবার চেষ্টা করলেন না কেন? তিনি বললেন যে তিনি আর সবাইকে সেকথা বলেছিলেন কিন্তু কেউ রাজী হয়নি, তিনিও একা একা এটা করতে সাহস পাননি।

আর একটা ঘটনা বলেই আমাদের এই আলোচনা শেষ করবো। এটা বড়ই অদ্ভুত ঘটনা, যা নিয়ে দুই ভদ্রমহিলা, মিস্ এলিজাবেথ মরিসন্ ও মিস্ ফ্র্যান্সেস ল্যামণ্ট 'অ্যান অ্যাড্‌ভেঞ্চার' নামে একটা বই লেখেন।

মিস্ মরিসন্ ও মিস্ ল্যামণ্ট ১৯০১ সালের আগস্ট মাসে একদিন বিকেলে প্যারিস থেকে ভার্সাই প্যালেস দেখতে যান। এর আগে তাঁরা আর কোন দিন ওখানে যান নি। খানিকক্ষণ প্রাসাদে ঘোরা-ঘুরি করে তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে পেটিট্ ট্রায়াননের দিকে গেলেন। মিস্ মরিসনের ধারণা ছিল যে সেটাই ছিল রাণীর আমোদ-প্রমোদের জায়গা। ঐ জায়গায় পৌঁছেই তাঁদের মন যেন কেমন বিষাদে ভরে উঠল, কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর গুমোট ভাব, গাছপালাগুলো সব যেন ছবির মত স্থির হয়ে আছে। ঘুরে ঘুরে তাঁরা দেখতে লাগলেন বাড়ীঘর, বাগান, চারদিক। কিছু লোকজনের সাক্ষাতও পেলেন যাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের সঙ্গে কথাও বলল। এই লোকজনদের পরনে ছিল কেমন যেন অদ্ভুত জামা কাপড়, গরমের দিনের অনুপোযোগী। কিন্তু এ জিনিসটা এবং আরও কিছু অদ্ভুত ব্যাপার তখন তাঁদের বিশেষ খেয়াল হয়নি, পরে খেয়াল হল এবং দুজনে তখন বলাবলি করতে লাগলেন যে ঐ জায়গায় নিশ্চয় ভুতুড়ে ব্যাপার কিছু আছে।

এর কিছু দিন পরে মিস্ ল্যামণ্ট একা একদিন পেটিট্ ট্রায়াননে যান এবং সেবারও ওখানে পৌঁছে আগের বারের মত মনটা তাঁর কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ভরে ওঠে এবং সেবারেও তিনি কিছু কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন।

আরও কিছুদিন পরে মিস্ ল্যামণ্ট ও মিস্ মরিসন্ ছুজনে আবার যান সেই জায়যায়। সেবার গিয়ে তাঁরা দেখেন যে জায়গাটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আগের বার অনেক গাছপালা ছিল এবার যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা। সরু একটা নদী, তার ওপর কাঠের পুল, পাহাড়ে ঝরনা আরও অনেক কিছু যা তাঁরা আগের বার দেখেছিলেন তার কিছুই নেই সেখানে।

এ সব দেখে ত' মিস্ মরিসন্ ও মিস্ ল্যামণ্ট একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা বুঝবার জন্য তখন তাঁরা খোঁজ খবর নিতে লাগলেন এবং ফ্রান্সের ইতিহাস পড়তে শুরু করলেন। ১৭৮৯ সালের পেটিট্ ট্রায়াননের ঐতিহাসিক বর্ণনা তাঁরা প্রথমবার ঐ জায়গায় যা দেখেছিলেন তার সঙ্গে মিলে গেল। লোকজনদের পোশাক তাঁরা যা দেখেছিলেন তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের স্টাইলের সঙ্গে মিলে গেল। কয়েকজন লোকের চেহারা ও সাজ-পোশাকের ধরন মিলে যায় ১৭৮৯ সালে ঐ জায়গায় ছিলেন এমন কয়েকজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোকের চেহারা ও পোশাকের বর্ণনার সঙ্গে।

ক্লোক জড়ানো, মাথায় স্লাউচ্ হ্যাট্, মুখে বসন্তের দাগ, কদাকার একজন লোককে দেখে সেদিন মিস্ মরিসন্ ও মিস্ ল্যামণ্ট ছুজনেই আঁৎকে উঠেছিলেন। ইতিহাস পড়ে তাঁরা জানতে পারলেন যে ঐ লোকটিই ছিল কঁ্যত্ দ্য ভঁদ্রেমিল, একজন ক্রীয়োল্, যে রাণীর প্রীতিভাজন ছিল এবং পরে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

মিস্ মরিসন্ এক ভদ্রমহিলাকে চত্বরে বসে থাকতে দেখেছিলেন এবং তাঁর অদ্ভুত সাজ-পোশাকের জন্য তাঁকে ভালভাবে লক্ষ্য

করেছিলেন। যদিও এই ভদ্রমহিলার কাছ দিয়েই দুজন গিয়েছিলেন মিস্ ল্যামণ্ট কিন্তু তাঁকে দেখতে পাননি। ঐ ভদ্রমহিলার চেহারা মিলে গেল মেরী অ্যাঁতোয়ানেতের একটা ছবির সঙ্গে এবং তাঁর সাজ-পোশাক হুবহু মিলে গেল ১৭৮৯ সালের একটা জার্ন্যালের বর্ণনার সঙ্গে।

মিস্ ল্যামণ্টের একজন ফরাসী বন্ধু বললেন যে তিনি ভার্সাই-এ তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছেন যে আগস্ট মাসের একটি বিশেষ দিনে আরও অনেকেই নাকি মেরী অ্যাঁতোয়ানেতকে এবং সেদিন যাঁরা যাঁরা পেটিট্ ট্রায়াননে ছিলেন তাঁদের দেখতে পেয়েছেন।[১]

আমি আর একটা বইতে পেয়েছি, চার্লস্ রিচেট্ বলেছেন যে প্যারিসের অধিবাসীরা অনেকেই তাঁকে জানিয়েছেন যে 'অ্যান অ্যাড্ভেঞ্চার' বইয়ের গ্রন্থকারদের মত তাঁদেরও নাকি অভিজ্ঞতা হয়েছিল।[২]

আর একটা বইয়ে জানতে পেরেছি যে এই গ্রন্থকারদের আসল নাম ছিল মিস্ মোবারলি ও মিস্ জোর্ডেইন এবং তাঁরা দুজনেই পর পর অক্সফোর্ডের সেণ্ট হিউ'জ কলেজ-এর প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন।[৩]

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটা বিচার করা যাক।

মেরী অ্যাঁতোয়ানেত ছিলেন ফ্রান্সের ষোড়শ লুই-এর রাণী। অপদার্থ স্বামীর ওপর বীতরাগ হয়ে তিনি রাজসভার কয়েকজন

১) 'An Adventure'-Elizabeth Morison, Frances Lamont. Macmillan & Co. Ltd. 1911.

২) 'The Enigma of Out-of-Body Travel'-Susy Smith. (A Signet Mystic Book). Published by the New American Library. Page 117.

৩) 'Guide to Modern Thought'-C. E. M. Joad. Pan Books Ltd, publisher. 1948. Page 208.

কুখ্যাত সদস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন। এই ব্যাপারে এবং রাজ্যের আর্থিক সঙ্কটের জন্য তাঁকে অযথা দায়ী করে জনসাধারণ রাণীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

রাজার বুদ্ধিহীনতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতার জন্য অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয় এবং ১৭৮৯ সালের পাঁচই অক্টোবর, এক ক্ষিপ্ত জনতা ভার্সাই প্রাসাদে ঢুকে পড়ে রাণীকে খুন করতে যায়। রাণী শেষ পর্যন্ত বেঁচে যান, কিন্তু জনতা পরের দিন রাজ পরিবারকে ভার্সাই প্রাসাদ ছেড়ে টুইলারিসে যেতে বাধ্য করে এবং সেখানে তাঁরা বন্দীর মত থাকেন। একবার ছদ্মবেশে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যান। ১৭৯৩ সালে, রাজাকে জানুয়ারী মাসে এবং রাণীকে অক্টোবর মাসে, গিলটিনে মাথা কেটে হত্যা করা হয়। মেরী অ্যাঁতোয়ানেত-এর বয়স তখন সবে আটত্রিশ।

অসময়ে এরকম ভয়ঙ্কর মৃত্যু এবং অতৃপ্ত কামনা বাসনা রাণীর আত্মাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। তাই মৃত্যুর একশ' বছর পরেও তাঁর এবং তাঁর বন্ধু বান্ধবদের প্রেতাত্মা, যাঁদের দুর্ভাগ্যজীবনেরও ঘটেছিল একই রকম পরিসমাপ্তি, সবাই মিলে ভার্সাই প্রাসাদে তাঁদের জীবনের দিনগুলি বার বার করে অভিনয় করে চলেছেন।

কেউ কেউ বলেন যে সৃষ্টির আদি থেকে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে তার সবকিছুরই একটা ছাপ রয়ে গেছে পৃথিবীতে। কিসের ওপর এরকম ছাপ পড়ে বা কি করে তা পড়ে বলা সম্ভব নয়, তবে এমন কিছু সেন্‌সিটিভ্ বা অনুভবশীল লোক আছেন যাঁরা সময় সময় এই সব সিনেমার ছবির মত দেখতে পান। শুধু দেখতেই পান না, ঐ সব ঘটনা সংশ্লিষ্ট কথাবার্তা শব্দ ইত্যাদি শুনতেও পান। পাশ্চাত্ত্যে এটাকে বলা হয় 'কস্‌মিক্ পিক্‌চার গ্যালারী' এবং প্রাচ্যে 'আকাশিক রেকর্ড' বা 'আকাশের স্মৃতি'।"

সুশান্ত বলে, "ভারী অদ্ভুত ব্যাপার ত' !"

"হ্যাঁ ভাই, ভারী অদ্ভুত। এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তা প্রায় সবই অদ্ভুত। এ জন্যই এ বিষয়ে খাপ ছাড়া দু একটা ঘটনা শুনলে তা সত্যি বলে বিশ্বাস হতে চায়না, কিন্তু সব রকম ঘটনার থেকে বিচার করলে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করাটাই শক্ত।

স্বর্গীয় ফ্রেড্রিক মায়ার্সের কথা নিশ্চয় মনে আছে তোমার, যিনি ইহলোকে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং পরলোক থেকে ক্রস্—করেস্পন্ডেন্স্ পাঠিয়ে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুর পর মিসেস্ হল্যাণ্ডের মারফৎ অটমেটিক রাইটিং-এ একটা ভারী সুন্দর কথা লিখেছিলেন—'..If it were possible for the soul to die back into earth life again I should die from sheer yearning to reach you--to tell you all that we imagined is not half wonderful enough for the truth—that immortality, instead of being a beautiful dream, is the one, the only reality, the strong golden thread on which all the illusions of all the lives are strung. If I could only reach you—if I could only tell you—I long for power, and all that comes to me is an infinite yearning—an infinite pain. Does any of this reach you, reach any one, or am I only wailing as the wind wails—wordless and unheeded ?' " [১]

১) Society for Psychical Research Proceedings-Vol. XXI. page 233.

(যদি আত্মার পক্ষে পুনরায় মরে পৃথিবীর জীবনে ফিরে আসা সম্ভবপর হত তোমাদের কাছে যাবার আকুল আকাঙ্ক্ষার জন্যই আমি আবার মরতাম—তোমাদের বলতে যে আমরা যা কিছু কল্পনা করেছিলাম তা সত্যের আদ্ধেকও বিস্ময়কর নয়—যে, অমরতা একটা সুন্দর স্বপ্ন নয়, এটাই একমাত্র সত্য, শক্ত সোনার সূতো যার মধ্যে গাঁথা রয়েছে সমস্ত জীবনের সমস্ত মায়া। যদি শুধু তোমাদের কাছে যেতে পারতাম—যদি শুধু তোমাদের বলতে পারতাম—আমি ক্ষমতা কামনা করি কিন্তু আমার কাছে আসে শুধু সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, সীমাহীন দুঃখ। এর কিছু কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়, কারো কাছে পৌঁছায়, নাকি আমি শুধু বিলাপ করছি, বাতাস যেমন বিলাপ করে—ভাষাহীন এবং উপেক্ষিত।)

সুশান্ত চুপ করে থাকে। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে বলে, "অনেক রাত হয়ে গেছে আজ যাই, কাল আবার আসবো তোমার ভৌতিক কাহিনী শুনতে।"